তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল,
তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং
তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর; (৯:৫)

কোরানে জিহাদ ও আক্রমণের আহ্বান

(তাফসীরসহ)

নরসুন্দর মানুষ

JIHAD

"to war against non-Muslims"

ধর্মকারী
dhormockery
নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ
নির্মিত

কোরানে
জিহাদ ও আক্রমণের আহ্বান

(তাফসীরসহ)

নরসুন্দর মানুষ

একটি ধর্মকারী ইবুক

www.dhormockery.com
www.dhormockery.net
www.kufrikitab.blogspot.com
dhormockery@gmail.com

কোরানে জিহাদ ও আক্রমণের আহ্বান

নরসুন্দর মানুষ

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

ধর্মকারী ইবুক

প্রকাশক

ধর্মকারী

ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ

নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি

নরসুন্দর মানুষ

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

Korane Jihad O Akromoner Ahobban, by NoroSundor Manush
First Edition: February, 2017
Published by: Dhormockery eBook
Dhaka, Bangladesh.
eBook by: NoroSundor Manush

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

সূচনা

সংবাদপত্রে দেখতে পাই মাঝে মধ্যেই, **'নিষিদ্ধ জিহাদী বই-পত্র উদ্ধার'!** মনে প্রশ্ন জাগে, জিহাদী বই কী কী? ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ **কোরান কি জিহাদী বই-পত্রের মধ্যে গণ্য? যদি তা না হয়, তবে তা কেন, আর যদি হয় তাই বা কেনো?**

মুহাম্মদের নবুয়্যত জীবনকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়; মক্কা অধ্যায় (প্রথম ১৩ বছর), আর মদিনা অধ্যায় (শেষ ১০ বছর); মদিনা অধ্যায়ের ১০ বছরে ১০০ টির বেশি যুদ্ধ এবং আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে! এর মধ্যে মাত্র দু'টি ছাড়া সবগুলোই শুরু হয়েছে মুসলমানদের পক্ষ থেকে, নবী জীবনী এবং হাদীসের 'মাগাজি' (আক্রমণ/যুদ্ধ) অধ্যায়গুলো নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলে তা চোখে পড়ে দ্রুতই! তবে কি **জীবনীগ্রন্থ আর হাদীস সংকলনকে জিহাদী বই-পত্র বলবো!** কিন্তু যা মানুষ সংকলন করে লিখেছে, তাতে তো ভুল থাকতেই পারে; তাই এগুলো নিয়ে আলোচনা মেনে নিতে চান না মডারেট মুসলমান মুমিনগন!

জিহাদ নিয়ে কী বলে কোরান? জিহাদ কি কেবলই মনের ময়লার বিরুদ্ধে, নাকি যুদ্ধ বলতে যা আমরা বুঝি (আক্রমণ, হত্যা, লুণ্ঠন, দখল, মানুষ বিক্রি, দাসী গ্রহণ, যুদ্ধনারী ভোগ); জিহাদ তাই?

এসবের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে এ ইবুকটিতে; আমি চেষ্টা করেছি কোরানে প্রাপ্ত সকল যুদ্ধ (জিহাদ) ও আক্রমণ সংক্রান্ত আয়াত তুলে আনতে; আর যেহেতু আমি

নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছি, তাই নিজের মনগড়া কোনো ব্যাখ্যা যোগ করিনি; কারণ কিছুতেই আমি প্রভাবিত করতে চাই না পাঠককে; পাঠক নিজ দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নেবে, **কোরানকে কি জিহাদী গ্রন্থ বলা চলে?**

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি বেছে নিয়েছি কোরানের প্রায় ১৫ টি বাংলা অনুবাদ, এবং সবচেয়ে সহজবোধ্য অনুবাদটি রাখার চেষ্টা করেছি; আর ব্যাখ্যা/তাফসীরের ক্ষেত্রে আমি বেছে নিয়েছি জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতের গ্রহণযোগ্যভাবে সরলীকরণ করে ব্যাখ্যা করতে প্রসিদ্ধ **সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রঃ)** এর কোরানের তাফসীর **'তাফহীমুল কুরআন'**-কে।

যদিও মওদুদী সাহেব অনেক আয়াতের আসল প্রেক্ষাপট লুকিয়েছেন (যেমন, বানু কুরাইযা); অনেক আয়াত সহনশীলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, অথবা ব্যাখ্যা না করে ছেড়ে দিয়েছেন, তবুও বেশির ভাগটাই লুকাতে পারেননি; কারণ **'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'** খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সেটা তিনি ভাল করেই জানতেন।

তার ব্যাখ্যা (তাফসীর) অংশটুক কেনো রকম পরিবর্তন করিনি আমি, এমনকি বানান ভুলটাও রেখে দিয়েছি; যেমনটা তিনি করেছেন ঠিক তেমনটাই রাখা হয়েছে; পাঠ সহজবোধ্য করার জন্য কিছু অংশের লেখার রং পরিবর্তন করা হয়েছে। এই ইবুকটি তৈরির পেছনে আরও একটি কারণ মাথায় রাখতে হয়েছে; আমি এটিকে বাংলা ভাষায় কোরানের জিহাদ (যুদ্ধ) সংক্রান্ত আয়াতের একটি রেফারেন্স সংকলন হিসাবে দাঁড় করাতে চেয়েছি; এখান থেকে আস্তিক, নাস্তিক, মুসলিম, অমুসলিম সকলেই খুব দ্রুত আয়াত এবং তার ব্যাখ্যা খুঁজে নিতে পারবেন।

একজন সচেতন পাঠক যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াত এবং আয়াতের ব্যাখ্যাগুলো পড়া শুরু করেন; তবে অবশ্যই পরিষ্কার হয়ে আসবে মদিনার ১০ বছর সময়ে কীভাবে শান্তির বদলে যুদ্ধের (জিহাদ) ধর্মে বদলে গিয়েছে ইসলাম! আর কেন

কোরান হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, একমাত্র মৌলিক জিহাদী গ্রন্থ!

তবে শেষে একটি কথা অগ্রিম বলে রাখা ভাল, যেভাবেই ভাবেন না কেন, আপনার মানবিকতা পশুত্বে পরিণত না হয়ে থাকলে এই ইবুকটি পাঠ করার পর থেকে কোরানকে **শান্তির বার্তা সংকলন** ভাবতে অবশ্যই দ্বিধায় ভুগবেন!

ধন্যবাদ

নরসুন্দর মানুষ

ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

Do It Yourself: (নিজে করি)

DIY ১:

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৭৮ আয়াত-এ **'কিসাস'** বলতে ব্যাখ্যায় কী বোঝানো হয়েছে?

DIY ২:

আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে কোরানের **বানু কুরাইযা** সংক্রান্ত আয়াত; যার ব্যাখ্যা লুকিয়েছেন মওদুদী সাহেব।

DIY ৩:

আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে, জিহাদী আয়াত থাকা মোট **কয়টি সূরা মক্কায়** প্রকাশিত হয়েছে?

DIY ৪:

আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে **এমন একটি আয়াত,** যা নবী মুহাম্মদের নবুয়্যত জীবনের প্রথম ২০ বছরের সকল শান্তির আয়াতকে, যুদ্ধ দিয়ে পাল্টে দিয়েছে?

DIY ৫:

এই ইবুকটি শেষ করার পর এবং উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার পরেও যদি আপনি **প্রমাণ করতে পারেন যে,** কোরান জিহাদী গ্রন্থ হবার যোগ্যতা রাখে না, এবং কোরানে **যুদ্ধ/আক্রমণ/সম্পদ দখল/জ্বালাও-পোড়াও** নেই; তবে আপনার মোবাইল (বিকাশ) নম্বার সহ বিস্তারিত লিখে মেইল করুন, আমি আপনাকে দেবো ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার পুরস্কার!

চলুন শুরু করি

অধ্যায়-০১: সূরা বাকারা (২) (গাভী)

জিহাদ ও আক্রমণ: ০১

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৭৮

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! **নিহতদের সম্বন্ধে তোমাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ ('কিসাস') বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী।** কিন্তু যদি কেহ তার ভাই কর্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমা প্রাপ্ত হয় তাহলে যেন ন্যায় সঙ্গতভাবে পাওনা সাব্যস্ত করা হয় এবং সদ্ভাবে তা পরিশোধ করে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা; অতঃপর যে কেহ সীমা লংঘন করবে তার জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

তাফসীর বলে

'কিসাস' হচ্ছে রক্তপাতের বদলা বা প্রতিশোধ। অর্থাৎ হত্যাকারীর সাথে এমন ব্যবহার করা যেমন সে নিহত ব্যক্তির সাথে করেছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, হত্যাকারী যেভাবে নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে ঠিক সেভাবে তাকেও হত্যা করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, **সে একজনকে হত্যা করেছে, তাকেও হত্যা করা হবে।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ০২

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৭৯

হে জ্ঞানবান লোকেরা! **কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে,** যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।

তাফসীর বলে

এটি দ্বিতীয় একটি জাহেলী চিন্তা ও কর্মের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। আগের মতো আজো বহু মস্তিস্কে এই চিন্তা দানা বেঁধে আছে। জাহেলিয়াত পন্থীদের একটি দল যেমন প্রতিশোধ গ্রহণের প্রশ্নে এক প্রান্তিকতায় চলে গেছে তেমনি আর একটি দল ক্ষমার প্রশ্নে আর এক প্রান্তিকতায় চলে গেছে এবং প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে তারা এমন জবরদস্ত প্রচারণা চালিয়েছে যার ফলে অনেক লোক একে একটি ঘৃণ্য ব্যাপার মনে করতে শুরু করেছে এবং দুনিয়ার বহু দেশ প্রাণদণ্ড রহিত করে দিয়েছে। কুরআন এ প্রসংগে বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বোধন করে তাদেরকে এই মর্মে সর্তক করে দিচ্ছে যে, **কিসাস বা 'প্রাণ হত্যার শাস্তি স্বরূপ প্রাণদণ্ডাদেশের' ওপর সমাজের জীবন নির্ভর করছে।** মানুষের প্রাণের প্রতি যারা মর্যাদা প্রদর্শন করে না তাদের প্রাণের প্রতি যারা মর্যাদা প্রদর্শন করে সে আসলে তার জামার আস্তিনে সাপের লালন করছে। তোমরা একজন হত্যাকারীর প্রাণ রক্ষা করে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের প্রাণ সংকটাপন্ন করে তুলছো।

জিহাদ ও আক্রমণ: ০৩

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯০

এবং যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং সীমা অতিক্রম করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেননা।

তাফসীর বলে

আল্লাহর কাজে যারা তোমাদের পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী তোমরা জীবন ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধন করতে চাও বলে যারা তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তোমাদের সংশোধন ও সংস্কার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য জুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছে ও শক্তি প্রয়োগ করছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। এর আগে মুসলমানরা যতদিন দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ছিল, তাদেরকে কেবলমাত্র ইসলাম প্রচারে হুকুম দেয়া হয়েছিল এবং বিপক্ষের জুলুম-নির্যাতেনর সবর করার তাকীদ করা হচ্ছিল। এখন মদীনায় তাদের একটি ছোট্ট স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই প্রথমবার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যারাই এই সংস্কারমূলক দাওয়াতের পথে সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে **অস্ত্র দিয়েই তাদের অস্ত্রের জবাব দাও।** এরপরই অনুষ্ঠিত হয় বদরের যুদ্ধ। তারপর একের পর এক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতেই থাকে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ০৪

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯১

আর **তাদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা কর এবং তারা তোমাদেরকে যেখান হতে বহিস্কার করেছে তোমরাও তাদেরকে সেখান হতে বহিস্কার কর এবং হত্যা অপেক্ষা অশান্তি** **(ফিতনা)** **গুরুতর এবং তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মাসজিদের নিকট যুদ্ধ করনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে তন্মধ্যে যুদ্ধ করে; কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর; অবিশ্বাসীদের জন্য এটাই প্রতিফল।**

তাফসীর বলে

এখানে ফিতনা শব্দটি ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যে অর্থে ইংরেজীতে Persecution শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ **কোন ব্যক্তি বা দল প্রচলিত চিন্তাধারা ও মতবাদের পরিবর্তে অন্য কোন চিন্তা ও মতবাদকে সত্য হিসেবে জানার কারণে তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং সমালোচনা ও প্রচারের মাধ্যমে সমাজে বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার সংশোধনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে,** নিছক এ জন্য তার ওপর জুলুম-নির্যাতন চালানো। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছেঃ নরহত্যা নিসন্দেহে একটি জঘণ্য কাজ কিন্তু কোন মানবিক গোষ্ঠী বা দল যখন জরপূর্বক নিজের স্বৈরতান্ত্রিক ও জুলুমতান্ত্রিক চিন্তাধারা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়, সত্য গ্রহণ থেকে লোকদেরকে জোরপূর্বক বিরত রাখে এবং যুক্তির পরিবর্তে পাশবিক শক্তি প্রয়োগে জীবন গঠন ও সংশোধনের বৈধ ও ন্যায়সংগত প্রচেষ্টার মোকাবিলা করতে শুরু করে তখন এসব নরহত্যার চাইতেও জঘণ্যতম অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। **এই ধরনের গোষ্ঠি বা দলকে অস্ত্রের সাহায্যে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া যে সম্পূর্ণ বৈধ ও ন্যায়সংগত তাতে সন্দেহ নেই।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ০৫

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯৩

আর ফিতনা দূর হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত **তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর;** অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তাহলে অত্যাচারীদের উপর ব্যতীত শত্রুতা নেই।

তাফসীর বলে

ইতিপূর্বে 'ফিতনা' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে তার থেকে একটু স্বতন্ত্র অর্থে তার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পূর্বাপর আলোচনা থেকে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে 'ফিতনা' বলতে এমন অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যখন **'দীন' আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্যই হয় ফিতনাকে নির্মুল করে দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া ।** আবার 'দীন' শব্দটির তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, আরবী ভাষায় দীন অর্থ হচ্ছে

''আনুগত্য'' এবং এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে জীবন ব্যবস্থা। এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যেখানে কোন সত্তাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মেনে নিয়ে তার প্রদত্ত বিধান ও আইনের আনুগত্য করা হয়। দীনের এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সমাজে যখন মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন সমাজের এই অবস্থাকে ফিতনা বলা হয়। এই ফিতনার জায়গায় এমন একটি ব্যবস্থার সৃষ্টি করা **ইসলামী জিহাদের লক্ষ্য যেখানে মানুষ একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুগত থাকবে।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ০৬

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯৪

নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস ও সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় পরস্পর সমান; **অতঃপর যে কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর** এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, আল্লাহ সংযমশীলদের সঙ্গী।

তাফসীর বলে

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে আরবদের মধ্যে **যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম এই তিনটি মাস হজ্জের জন্য নির্ধারিত থাকার নিয়ম প্রচলিত ছিল। আর রজব মাসকে উমরাহর জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল।** এই চার মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যা, লুণ্ঠন ও রাহাজানি নিষিদ্ধ ছিল। কা'বা যিয়ারতকারীদেরকে নিশ্চিন্তভাবে ও নিরাপদে আল্লাহর ঘরে যাওয়ার এবং সেখান থেকে আবার নিজেদের গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ জন্য এ মাসগুলোকে হারাম মাস বলা হতো। অর্থাৎ এ মাসগুলো হলো সম্মানিত। এখানে উল্লেখিত আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, হারাম মাসগুলোর মর্যাদা রক্ষায় যদি কাফেররা তৎপর হয় তাহলে মুসলমানদেরও তৎপর হতে হবে। আর যদি কাফেররা যদি এই মাসগুলোর মর্যাদা পরোয়া না করে কোন হারাম মাসে মুসলমনাদের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে মুসলমানরাও হারাম মাসে সংগতভাবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে।

আরবদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লুটতরাজের ক্ষেত্রে 'নাসী' প্রথা প্রচলিত থাকার কারণে এই অনুতির প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। এই প্রথা অনুযায়ী তারা কারোর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে অথবা লুটতরাজ করার জন্য কারোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে কোন একটি হারাম মাসে তার ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালাতো তারপর জন্য একটি হালাল মাসকে তারা জায়গায় হারাম গণ্য করে পূর্বের হারাম মাসের মর্যাদাহানির বদলা দিতো। তাই মুসলমানদের সামনে এ প্রশ্ন দেখা দিল যে, **কাফেররা**

যদি 'নাসী'র বাহানা বানিয়ে কোন হারাম মাসে মুসলমানদের ওপর আক্রমন করে বসে তখন তারা কি করবে। এই প্রশ্নের জবাব এই আয়াতে দেয়া হয়েছে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ০৭

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২১৬

জিহাদকে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য রূপে অবধারিত করা হয়েছে এবং এটি তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই (তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও।

তাফসীর বলে

কোনো ব্যাখ্যা নেই;

জিহাদ ও আক্রমণ: ০৮

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২১৭

তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলঃ ওর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়। আর আল্লাহর পথে প্রতিরোধ করা এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা ও পবিত্র মাসজিদ হতে তার **অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ;** এবং অশান্তি সৃষ্টি হত্যা অপেক্ষা গুরুতর এবং যদি তারা সক্ষম হয় তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরাতে না পারা পর্যন্ত নিবৃত্ত হবেনা; আর তোমাদের মধ্যকার কেহ যদি স্বধর্ম হতে ফিরে যায় এবং ঐ কাফির অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে তাহলে তার ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে; তারাই অগ্নির অধিবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

তাফসীর বলে

এ বিষয়টি একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখ্লা' নাম স্থানে আটজনের একটি বাহিনী পাঠান। কুরাইশদের গতিবিধি ও তাদের সংকল্প সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করেন। **যুদ্ধ করার কোন অনুমতি তাদেরকে দেননি। কিন্তু পথে তারা কুরাইশদের একটি ছোট বাণিজ্যিক কাফেলার মুখোমুখি হয়। কাফেলার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তারা একজনকে হত্যা করে এবং বাদবাকি সবাইকে গ্রেফতার করে অর্থ ও পণ্য সম্ভারসহ তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসে।** তাদের এ পদক্ষেপটি এমন এক সময় গৃহীত হয় যখন রজব শেষ হয়ে শাবান মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাদের এ আক্রমণটি রজব মাসে (অর্থাৎ হারাম মাসে) সংঘটিত হয়েছিল কি না বা ব্যাপারটি সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কিন্তু কুরাইশরাও পর্দান্তরালে তাদের সাথে যোগসাজশকারী ইহুদী ও মদীনার মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাবার জন্য এ ঘটনাটির কথা চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়াতে থাকে। তারা কঠিন আপত্তি জানিয়ে অপ্রচার করতে থাকে হাঁ, এরা বড়ই আল্লাওয়ালা হয়েছে। অথচ হারাম মাসেও রক্তপাত করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ আয়াতে তাদের এ আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। জবার আর নির্যাস হচ্ছেঃ হারাম মাসে লড়াই করা নিসন্দেহে বড়ই গর্হিত কাজ। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা তাদের জন্য শোভা পায় না, যারা শুধুমাত্র এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কারণে তেরো বছর ধরে তাদের অসংখ্য ভাইয়ের ওপর যুলুম নির্যাতন চালিয়ে এসেছে। তাদেরকে এমনভাবে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করেছে যে, তারা স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তারপর এখানেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। তাদের ঐ ভাইদের মসজিদে হারামে যাবার পথও বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ মসজিদে হারাম কারোর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। গত দু'হাজার বছর থেকে কোন দিন কাউকে এ ঘরের যিয়ারতে বাধা দেয়া হয়নি। **কাজেই এ ধরনের কলংকিত চরিত্রের অধিকারী জালেমরা কোন মুখে সামান্য একটি সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে এত বড় হৈচৈ করে বেড়াচ্ছে এবং আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করে চলছে।** অথচ এ সংঘর্ষে নবীর অনুমতি ছাড়াই সবকিছু ঘটেছে। এ ঘটনাটিকে বড় জোর এভাবে বলা যেতে পারে, একট ইসলামী জামায়াতের কয়েকজন লোক একটি দায়িত্বহীন কাজ করে বসেছে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ০৯

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২১৮

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও **আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে,** এরাই আল্লাহর রহমত আশা করে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর বলে

জিহাদ অর্থ হচ্ছে, কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে নিজের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এটি নিছক যুদ্ধের সমার্থক কোন শব্দ নয়। **যুদ্ধের জন্য আরবীতে 'কিতাল' (রক্তপাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়। জিহাদের অর্থ তার চাইতে ব্যাপক।** সব রকমের প্রচেষ্টা ও সাধনা এর অন্তরভূক্ত। মুজাহিদ এমন এক ব্যক্তিকে বলা হয়, যে সর্বক্ষন নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনে নিমগ্ন, যার মস্তিস্ক সবসময় ঐ উদ্দেশ্য প্রচারণায় নিয়োজিত। মুজাহিদের হাত, পা ও শরীরের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগ জিহাদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য সারাক্ষন প্রচেষ্টা, সাধনা ও পরিশ্রম করে চলছে। **জিহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সে নিজের সম্ভাব্য সমস্ত উপায়-উপকরণ নিয়োগ করে, পূর্ণ শক্তি দিয়ে এই পথের সমস্ত বাধার মোকাবিলা করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন প্রাণ উৎসর্গ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন নির্দ্বিধায় এগিয়ে যায়।** এর নাম 'জিহাদ' আর আল্লাহর পথে জিহাদ হচ্ছেঃ এ সবকিছু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে। এই দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর দীন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহর বানী ও বিধান দুনিয়ায়া সমস্ত মতবাদ, চিন্তা ও বিধানের ওপর বিজয় লাভ করবে। মুজাহিদের সামনে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ থাকবে না।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১০

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২৪৪

তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর বলে

কোনো ব্যাখ্যা নেই;

এখন থেকে যেসব আয়াতের ব্যাখ্যা মওদুদী সাহেব করেন নি; তা আর উল্লেখ করা হবে না।

অধ্যায়-০২: সূরা আল ইমরান (০৩) (ইমরানের পরিবার)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১১

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১২১

আর স্মরণ করো তুমি ভোরে তোমার পরিজনদের কাছ থেকে **যাত্রা করলে যুদ্ধের জন্য বিশ্বাসীদের অবস্থান নির্দ্ধারণ করতে।** আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

তাফসীর বলে

এখান থেকে চতুর্থ ভাষণ শুরু হচ্ছে। **ওহোদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়। এখানে ওহোদ যুদ্ধের ওপর মন্তব্য করা হয়েছে।** আগের ভাষণটি শেষ করার সময় বলা হয়েছিল, '**"যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন কৌশল কার্যকর হতে পারবেনা"।** এখন যেহেতু ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণেই দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে সবরের অভাব ছিল এবং কোন কোন মুসলমানের এমন কিছু ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল যা ছিল আল্লাহভীতি বিরোধী, তাই তাদের এই দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্কবাণী সম্বলিত এ ভাষণটি উপরোক্ত ভাষনের শেষ বাক্যটির পরপরই তার সাথে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ ভাষণটির বর্ণনাভংগী বড়ই বৈশিষ্টময়। ওহোদ যুদ্ধের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটির ওপর পৃথক পৃথকভাবে কয়েকটি মাপাজোখা শব্দ সমন্বিত ভারসাম্যপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে শিক্ষনীয় মন্তব্য করা হয়েছে। এগুলো বুঝতে হলে সংশ্লিষ্ট ঘটণাগুলোর পটভূমি জানা একান্ত অপরিহার্য।

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের শুরুতে মক্কার কুরাইশরা প্রায় তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করে। সংখ্যায় বেশী হবার পরও অস্ত্রশস্ত্রও তাদের কাছে ছিল মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশী। এর ওপর ছিল তাদের বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার তীব্র আকাংখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অভিজ্ঞ সাহাবীগণ মদীনায় অবরুদ্ধ হয়ে প্রতিরক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি এমন কতিপয় শাহাদাতের আকাংখায় অধীরভাবে

প্রতীক্ষারত তরুণ সাহাবী শহরের বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করার ওপর জোর দিতে থাকেন। অবশেষে তাদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে বের হবার ফায়সালা করেন। এক হাজার লোক তাঁর সাথে বের হন। কিন্তু 'শওত' নামক স্থানে পৌছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশো সংগী নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তার এহেন আচরণে মুসলিম সেনাদল বেশ বড় আকারের অস্থিরতা ও হতাশার সঞ্চার হয়। এমন কি বনু সাল্মা ও বনু হারেসার লোকরা এত বেশী হতাশ হয়ে পড়ে যে, তারাও ফিরে যাবার সংকল্প করে ফেলেছিল।

কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ী সাহাবীগণের প্রচেষ্টায় তাদের মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা দূর হয়ে যায়। এই অবশিষ্ট সাতশো সৈন্য নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং ওহোদ পর্বতের পাদদেশে (মদীনা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে) নিজের সেনাবাহিনীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যার ফলে পাহাড় থাকে তাদের পেছন দিকে এবং সামনের দিকে থাকে কুরাইশ সেনাদল। একপাশে এমন একটি গিরিপথ ছিল, যেখান থেকে আকস্মিক হামলা হবার আশংকা ছিল। সেখানে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজের একটি বাহিনী মোতায়েন করেন। তাদেরকে জোর তাকীদ দিয়ে জানিয়ে দেনঃ "কাউকে আমাদের ধারে কাছে ঘেষঁতে দেবে না। কোন অবস্থায় এখান থেকে সরে যাবে না। যদি তোমরা দেখো, পাখিরা আমাদের গোশত ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে, তাহলেও তোমরা নিজেদের জায়গা থেকে সরে যাবে না"। অতপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লা ভারী থাকে। এমনকি মুশরিকদের সেনাবাহিনীতে বিশৃংখলা দেখা দেয়। তারা বিচ্ছিন্ন –বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু এই প্রাথমিক সাফল্যকে পূর্ণ বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়ে দেবার পরিবর্তে **গনীমাতের মাল আহরণ করার লোভ মুসলমানদের বশীভূত করে ফেলে। তারা শত্রু সেনাদের ধন-সম্পদ লুট করতে শুরু করে।**

ওদিকে যে তীরন্দাজদেরকে পেছনে দিকের হেফাজতে নিযুক্ত করা হয়েছিল,তারা যখন দেখতে পেলো শত্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে এবং গনীমাতের মাল লুট করা হচ্ছে তখন তারাও নিজেদের জায়গা ছেড়ে গনীমাতের মালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কড়া নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বার বার বাঁধা দিতে থাকেন। কিন্তু মাত্র কয়েকজন ছাড়া কাউকে থামানো যায় নি। কাফের সেনাদলের একটি বাহিনীর কমাণ্ডার খালেদ ইবনে অলীদ যথা সময়ে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি নিজের বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের পেছন দিক থেকে এক পাক ঘুরে এসে গিরিপথে প্রবেশ করে আক্রমণকরে বসেন। আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর তাঁর মাত্র কয়েকজন সংগীকে নিয়ে এই আক্রমণ সামাল দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। গিরিপথের ব্যূহ ভেদ করে খালেদ তার সেনাদল দিয়ে অকস্মাৎ মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। খালেদের বাহিনীর এই আক্রমণ পলায়নের কাফের বাহিনীর মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। তারাও পেছন ফিরে মুসলমানদের ওপর একযোগে আক্রমণ করে বসে। এভাবে মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা বদলে যায়। হঠাৎ এই

অপ্রত্যাশিত অবস্থার মুখোমুখি হয়ে মুসলমানরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের একটি বড় অংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়নমুখী হয়। তবুও কয়েক জন সাহসী সৈন্য তখনো যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। এমন সময় গুজব ছড়িয়ে পড়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। এ গুজবটি সাহাবায়ে কেরামের অবশিষ্ট বাহ্যিক জ্ঞানটুকুও বিলুপ্ত করে দেয়। এতক্ষণ যারা ময়দানে লড়ে যাচ্ছিলেন এবার তারাও হিম্মতহারা হয়ে বসে পড়েন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে ছিলেন মাত্র দশ বারো জন উৎসর্গীত প্রাণ মুজাহিদ। তিনি নিজেও আহত ছিলেন। পরিপূর্ণ পরাজয়ে আর কিছুই বাকি ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে সাহাবীগণ জানতে পারলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত আছেন। কাজেই তারা সবদিক থেকে একে একে তাঁর চারদিকে সমবেত হতে থাকে। তারা তাঁকে নিরাপদে পর্বতের ওপরে নিয়ে যান। এ সময়ের এ বিষয়টি আজো দুর্ব্যেধ্য রয়ে গেছে এবং এ প্রশ্নটির জবাব আজো খুঁজে পাওয়া যায়নি যে,কাফেররা তখন অগ্রবর্তী হয়ে ব্যাপকভাবে আক্রমণ না চালিয়ে কিসের তাড়নায় নিজেরাই মক্কায় ফিরে গিয়েছিল। মুসলমানরা এত বেশী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে পূনর্বার এক জায়গায় একত্র হয়ে যথারীতি যুদ্ধ শুরু করা কঠিন ছিল কাফেররা তাদের বিজয়কে পূর্ণতার প্রান্তসীমায় পৌছাতে উদ্যোগী হলে তাদের সাফল্য লাভ অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। **কিন্তু তারা নিজেরাই বা কেন ময়দানে ছেড়ে চলে গিয়েছিল তা আজো অজানা রয়ে গেছে।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১২

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১২২

স্মরণ করো! তোমাদের মধ্যে থেকে **দুইটি দল ভীরুতা (যুদ্ধে) দেখাবার মনস্থ করেছিল,** আর আল্লাহ্ ছিলেন তাদের উভয়ের অভিভাবক, আর আল্লাহ্‌র উপরেই তাহলে বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত।

তাফসীর বলে

এখানে বনু সাল্মা ও বনু হারেসার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। **আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীদের ময়দান থেকে সরে পড়ার কারণে তারা সাহস হারিয়ে ফেলেছিল।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৩

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১২৩

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ **তোমাদেরকে বদর যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন** এবং তোমরা দুর্বল ছিলে; অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৪

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১২৪

স্মরণ কর, যখন তুমি মুমিনদেরকে বলছিলে, 'তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তোমাদেরকে **তিন হাজার নাযিলকৃত ফেরেশতা দ্বারা (যুদ্ধে) সাহায্য করবেন'?**

তাফসীর বলে

মুসলমানরা যখন দেখলেন, একদিকে শত্রুদের সংখ্যা তিন হাজার আর অন্যদিকে **তাঁদের মাত্র এক হাজার থেকেও আবার তিনশো চলে যাচ্ছে, তখন তাদের মনোবল ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে একথা বলেছিলেন।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৫

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১২৫

হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তারা (অর্থাৎ শত্রুরা) মুহূর্তের মধ্যে এখানে তোমাদের উপর এসে পড়ে, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক বিশেষভাবে চিহ্নিত (তিন হাজার নয়) **পাঁচ সহস্র ফেরেশতা দ্বারা (যুদ্ধে) তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৬

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১২৬

বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। **আর সাহায্য (যুদ্ধে) শুধুমাত্র পরাক্রান্ত (বিজয়ী),** মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে,

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৭

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৪০

যদি তোমাদেরকে আঘাত স্পর্শ করে, অনুরূপ আঘাত তো অপর পক্ষকেও স্পর্শ করেছিল। (জয়-পরাজয়ের) এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি যাতে আল্লাহ মু'মিনদেরকে চিনে নিতে পারেন এবং **তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন,** বস্তুতঃ আল্লাহ যালিমদেরকে ভালবাসেন না।

তাফসীর বলে

এখানে বদর যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে । একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, **বদর যুদ্ধের আঘাতে যখন কাফেররা হিম্মতহারা হয়নি তখন ওহোদ যুদ্ধের এই আঘাতে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলছো কেন।**

তোমাদের থেকে কিছু সংখ্যা শহীদ নিতে চাইছিলেন। অর্থাৎ কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, বর্তমানে তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও মুনাফিক যে মিশ্রিত দলটি গড়ে উঠেছে তার মধ্য থেকে এমন সব লোকদের ছেঁটে আলাদা করে নিতে চাইছিলেন যারা আসলে (সমগ্র মানব জাতির ওপর সাক্ষী) অর্থাৎ এই মহান পদের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত। কারণ এই মহান ও মর্যাদাপূর্ণ পদেই মুসলিম উম্মাহকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৮

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৪১

এবং (এ জন্যেও) যেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে সংশোধন করেন ও **কাফিরদের (যুদ্ধে) নিশ্চিহ্ন করেন।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৯

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৪২

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা **তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ২০

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৪৩

(শাহাদাতের) মৃত্যুর সাক্ষাৎ লাভের পূর্বে তোমরা তা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা দিব্যদৃষ্টিতে দেখলে।

তাফসীর বলে

লোকদের শাহাদাত লাভের যে আকাংখার অত্যধিক চাপে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার বাইরে এসে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এখানে সেই আকাংখার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ২১

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৪৬

আর **কত নাবী যুদ্ধ করেছে,** তাদের সাথে ছিল বহু লোক, তখন তারা আল্লাহর পথে **তাদের উপর সংঘটিত বিপদের জন্য হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি, দুর্বল, অপারগ হয়নি,** বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ **নিজেদের সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের স্বল্পতা ও অভাব এবং অন্যদিকে কাফেরদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য দেখেও তারা বাতিলের কাছে অস্ত্র সম্বরণ করেনি।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ২২

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৫২

(উহূদের রণক্ষেত্রে) আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় ওয়া'দা সঠিকরূপে দেখালেন, **যখন তোমরা আল্লাহর নির্দেশে কাফিরদেরকে নিপাত করছিলে,** অতঃপর যখন তোমরা **নিজেরাই (পার্থিব লাভের বশে) দুর্বল হয়ে গেলে** এবং (নেতার) হুকুম সম্বন্ধে মতভেদ করলে এবং তোমাদেরকে **তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু (গনীমাতের মাল)** দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে, তোমাদের কেউ কেউ দুনিয়ার প্রত্যাশী হলে এবং কেউ কেউ পরকাল চাইলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে শত্রুদের হতে ফিরিয়ে দিলেন

তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, আল্লাহ অবশ্য তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ তোমরা যে মারাত্মক ভূল করেছিলে আল্লাহ যদি তা মাফ করে না দিতেন, তাহলে এখন আর তোমাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না। মহান আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর ফলে এবং **তাঁর সাহায্য ও সহায়তার বদৌলতেই তোমাদের শত্রুরা তোমাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করার পরও নিজেদের চেতনা ও সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল এবং বিনা কারণে নিজেরাই পিছে হটে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ২৩

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৫৩

(স্মরণ কর) যখন তোমরা উঁচু জমির দিকে উঠছিলে এবং কারও দিকে ফিরে তাকানোর মত হুঁশটুকু তোমাদের ছিল না এবং রসূল তোমাদের পশ্চাতে থেকে তোমাদেরকে ডাকছিল। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টের উপর কষ্ট প্রদান করলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছে (তার কারণ উপলব্ধি করার পর ভবিষ্যতে) তার জন্য দুঃখিত না হও, বস্তুতঃ তোমরা যা-ই কর আল্লাহ সে ব্যাপারে বিশেষভাবে অবহিত।

তাফসীর বলে

যখন মুসলমানদের ওপর হঠাৎ একই সময় দু'দিক থেকে আক্রমণ হলো এবং তাদের সারিগুলো ভেঙে চারদিকে বিশৃংখলা অবস্থায় ছড়িয়ে পড়লো তখন কিছু লোক মদীনার দিকে পালাতে লাগলেন এবং কিছু ওহোদ পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও সরে গেলেন না। চারদিক থেকে শত্রুদের আক্রমণ হচ্ছিল। **তার চারদিকে ছিলমাত্র দশ বারোজন লোকের একটি ছোট্ট দল।** এহেন সংগীণ অবস্থায়ও আল্লাহর নবী পাহাড়ের মতো নিজে অটলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি পালায়নপর লোকদের ডেকে ডেকে বলছিলেনঃ "আল্লার বান্দারা, আমার দিকে এসো! আল্লাহর বান্দারা, আমার দিকে এসো"

দুঃখ পরাজয়ের, দুঃখ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু সংবাদের। দুঃখ নিজেদের বিপুল সংখ্যক নিহত ও আহতদের । দুঃখ এই চিন্তায় যে, এখন নিজেদের বাড়ি-ঘরেরও নিরাপত্তা নেই এবং

এখনই মদীনার সমগ্র জনসংখ্যার চাইতেও বেশী তিন হাজার শত্রু সৈন্য পরাজিত সেনাদলকে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে শহরের গলি কুচায় ঢুকে পড়েব এবং নগরীর সবকিছু ধ্বংস ও বরবাদ করে দেব।

জিহাদ ও আক্রমণ: ২৪

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৫৪

অতঃপর কষ্টের পর **আল্লাহ তোমাদের প্রতি শান্তি-তন্দ্রা প্রেরণ করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করল এবং অন্যদল মূর্খের মতো আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করতঃ** নিজেরাই নিজেদের জীবনকে উদ্বেগাকুল করে বলল, কাজ-কর্মের ব্যাপারে (সিদ্ধান্ত গ্রহণের) আমাদের কিছুমাত্র অধিকার আছে কি? বল, 'সমস্তই আল্লাহর নিরঙ্কুশ অধিকারভুক্ত'। তারা এমন সব কথা অন্তরে পোষণ করে- যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, 'যদি মতামত প্রদানের অধিকার আমাদের কিছুমাত্রও থাকত, তাহলে আমরা এ স্থলে নিহত হতাম না'। বলে দাও, 'যদি তোমরা তোমাদের ঘরেও থাকতে, তথাপি যাদের ভাগ্যে মৃত্যু লেখা ছিল, তারা তাদের এ মৃত্যুশয্যার পানে বের হয়ে পড়ত'। এবং এজন্যও যে আল্লাহ তোমাদের অন্তরের ভেতরের বিষয়গুলো পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরস্থ বিষয়গুলোকে পরিষ্কার করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ সকলের অন্তরের কথা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।

তাফসীর বলে

ইসলামী সেনদালের কিছু কিছু লোক এসময় এই একটি নতুন ও অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। হযরত আবু তালহা এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। তিনি নিজে বর্ণনা করছেন, এ অবস্থায় আমাদের ওপর তন্দ্রাভাব এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে, আমাদের হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ছিল।

জিহাদ ও আক্রমণ: ২৫

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৫৫

দু'দল পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার দিন **তোমাদের মধ্যে যারা পলায়নপর হয়েছিল, তোমাদের কোন কোন অতীত কার্যকলাপের জন্য শয়ত্বান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল** এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, অতি সহনশীল।

জিহাদ ও আক্রমণ: ২৬

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৫৬

হে ঈমাণদারগণ! **তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই বন্ধুরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা জেহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে মরতোও না আহতও হতো না।** যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই কর না কেন, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ একথাগুলো সত্য নয়। এর পেছনে কোন ভিত্তি নেই। **আল্লাহর ফায়সালাকে কেউ নড়াতে পারে না।** এটিই সত্য। কিন্তু যারা আল্লাহার প্রতি ঈমান রাখে না এবং সবকিছুকে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করে,তাদের জন্য এ ধরনের আন্দাজ অনুমান কেবল তাদের আক্ষেপ ও হতাশাই বাড়িয়ে দেয়। তারা কেবল এই বলে আফসোস করতে থাকে, হায়! যদি এমনটি করতাম তাহলে এমনটি হতো।

জিহাদ ও আক্রমণ: ২৭

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৫৭

আর যদি **আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের হত্যা করা হয় অথবা তোমরা মারা যাও,** নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পরিত্রাণলাভ ও করুণাপ্রাপ্তি তারা যা জমা করে তার চাইতে উৎকৃষ্টতর।

জিহাদ ও আক্রমণ: ২৮

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৫৮

আর যদি **তোমরা মারাই যাও বা তোমাদের হত্যা করা হয়,** নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ২৯

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৬৫

কী ব্যাপার! তোমাদের উপর যখন বিপদ এসেছে **অথচ তোমরা তো (বদর যুদ্ধে তোমাদের শত্রুদের) এটা অপেক্ষা দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে,** এখন তোমরা বলছ, ‘এটা কোথেকে আসল’? (তাদেরকে) বল, ‘ওটা তোমাদের নিজেদের নিকট থেকেই এসেছে’, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

তাফসীর বলে

নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ অবশ্যি যথার্থ সত্য অবগত ছিলেন এবং তাঁদের কোন প্রকার বিভ্রান্তির শিকার হবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে সাধারণ মুসলমানরা মনে করছিলেন, আল্লাহর রসূল যখন আমাদের সংগে আছেন এবং আল্লাহ আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা দান করছেন তখন কোন অবস্থাতেই কাফেররা আমাদের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে না। **তাই ওহোদ পরাজিত হবার পর তারা ভীষণভাবে আশাহত হয়েছেন। তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, এ কি হলো। আমরা আল্লাহর দীনের জন্য লড়তে গিয়েছিলাম। তাঁর প্রতিশ্রুতি ও সাহায্য আমাদের সংগে ছিল। তাঁর রসূল সশরীরে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। এরপরও আমরা হেরে গেলাম।** এমন লোকদের হাতে হেরে গেলাম, যারা আল্লাহর দীনকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য এসেছিল। মুসলমানদের এই বিস্ময় পেরেশানী ও হতাশা দূর করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়।

ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের সত্তর জন লোক শহীদ হয়। অন্যদিকে ইতপূর্বে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে সত্তর জন্য কাফের নিহত এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছিল।

অর্থাৎ এটা তোমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও ভুলের ফসল। তোমরা সবর করোনি। তোমাদের কোন কোন কাজ হয়েছে তাকওয়া বিরোধী। তোমরা নির্দেশ অমান্য করেছো। অর্থ-সম্পদের লোভো আত্মহারা হয়েছো। পরস্পরের মধ্যে বিবাধ ও মতিবরোধ করেছো। এতোসব করার পর আবার জিজ্ঞেস করছো, বিপদ এলো কোথা থেকে।

অর্থাৎ **আল্লাহ যদি তোমাদের বিজয় দান করার শক্তি রাখেন তাহলে পরাজয় দানকরার শক্তিও রাখেন।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ৩০

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৬৬

আর **তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছিল দুই দল মুখোমুখি হওয়ার দিন** তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং যাতে তিনি মুমিনদেরকে জেনে নেন।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৩১

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৬৭

আর মুনাফিকদেরকেও জেনে নেয়া। তাদেরকে বলা হয়েছিল; এসো, **'আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, কিংবা (কমপক্ষে) নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা কর'। তখন তারা বলল, 'যদি আমরা জানতাম যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম'।** তারা ঐ দিন ঈমানের চেয়ে কুফরীরই নিকটতম ছিল, তারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই, যা কিছু তারা গোপন করে আল্লাহ তা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন।

তাফসীর বলে

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন তিনশো মুনাফিক নিয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে যেতে লাগলো তখন কোন কোন মুসলমান গিয়ে তাকে বুজাবার চেষ্টা করলো এবং মুসলিম সেনাদলে ফিরে আসার জন্য রাজী করতে চাইলো। কিন্তু সে জবাব দিল, **"আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আজ যুদ্ধ হবে না, তাই আমরা চলে যাচ্ছি। নয়তো আজো যুদ্ধ হবার আশা থাকলো আমরা অবশ্যি তোমাদের সাথে চলে যেতাম"**

জিহাদ ও আক্রমণ: ৩২

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৬৯

আর **যারা আল্লাহর পথে (যুদ্ধে) নিহত হয়,** তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।

তাফসীর বলে

মৃত্যু শব্দটি এবং এর ধারণা মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে । মৃত্যুর কথা শুনে সে সাহস ও শক্তি হারিয়ে ফেলে । **তাই আল্লাহর পথে শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে । কারণ তাদেরকে মৃত বললে ইসলামী দলের লোকদের জিহাদ, সংঘর্ষ ও প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণা স্তব্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।** এর পরিবর্তে ঈমানদারদের মনে এই চিন্তা বদ্ধমূল করতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি প্রাণ দেয় সে আসলে চিরন্তন জীবন লাভ করে । এই চিন্তাটি প্রকৃত ব্যাপারের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীলও । এ চিন্তা পোষণের ফলে সাহস ও হিম্মত তরতাজা থাকে এবং উত্তরোত্তর বেড়ে যেতেও থাকে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৩৩

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৭২

যারা (যুদ্ধে) আঘাত পাওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশকে মান্য করেছে তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে ও সংযত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান।

তাফসীর বলে

ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে বেশ কয়েক মনযিল দূরে চলে যাবার পর মুশরিকদের টনক নড়লো। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, এ আমরা কি করলাম! মুহাম্মাদের (সা) শক্তি ধ্বংস করার যে সুবর্ণ সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম, তা হেলায় হারিয়ে ফেললাম। কাজেই তারা এক জায়গায় থেমে গিয়ে পরামর্শ করতে বসলো। সিদ্ধান্ত হলো, এখনি মদীনার ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ চালাতে হবে। সিদ্ধান্ত তো তারা করে ফেললো তড়িঘড়ি। কিন্তু আক্রমণ করার আর সাহস হলো না। কাজেই মক্কায় ফিরে এলো। ওদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও আশংকা ছিল, কাফেররা আবার ফিরে এসে মদীনার ওপর আক্রমণ না করে বসে। **তাই ওহোদ যুদ্ধের পরদিনই তিনি মুসলমানদের একত্র করে বললেন, কাফেরদের পেছনে ধাওয়া করা উচিত।** যদিও সময়টা ছিল অত্যন্ত নাজুক তবুও যারা সাচ্চা মু'মিন ছিলেন তাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের **সাথে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। এ জায়গাটি মদীনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত। এ আয়াতে এ প্রাণ উৎসর্গকারী মু'মিন দলের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।**

এ আয়াত ক'টি ওহোদ যুদ্ধের এক বছর পর নাযিল হয়েছিল। কিন্তু ওহোদের ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে এগুলোকে এ ভাষনের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৩৪

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৭৩

যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, **তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর।** তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কার্য উদ্ধারকারী!

জিহাদ ও আক্রমণ: ৩৫

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৯৫

অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। **তোমরা পরস্পর এক।** তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং **যারা যুদ্ধ করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে,** অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব। এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করব জান্নাতে যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ তোমরা সবাই মানুষ । আমরা দৃষ্টিতে তোমরা সবাই সমান। আমার এখানে নারী-পুরুষ, চাকর-মনিব, সাদা-কালো ও বড়-ছোটর মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন ভিন্ন ভিন্ন নীতি এবং তাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মীমাংসা করার সময় আলাদা আলাদা মানদণ্ড কায়েম করা হয় না।

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন কোন অমুসলিম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেঃ মূসা নবী 'আসা' (অলৌকিক লাঠি) ও উজ্জ্বল হাত এনেছিলেন। ঈসা নবী অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন এবং কুষ্ঠরোগীকে নিরামত করতেন। অন্যান্য নবীরাও কিছু না কিছু মু'জিযা এনেছিলেন। আপনি কি এনেছেন। একথার জবাবে নবী সাল্লাল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রুকূ'র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে বলেন, আমি এগুলো এনেছি।

অধ্যায়-০৩: সূরা আন নিসা (০৪) (নারী)

জিহাদ ও আক্রমণ: ৩৬

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৭১

হে মু'মিনগণ! **তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষার সরঞ্জাম তুলে নাও, অতঃপর পৃথকভাবে বহির্গত হও অথবা সম্মিলিতভাবে অভিযান কর।**

তাফসীর বলে

উল্লেখ্য এ ভাষণটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন ওহোদ যুদ্ধের পরাজয়ের পর মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার গোত্রগুলোর সাহস বেড়ে গিয়েছিল এবং বিপদ আপদ চতুর্দিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলেছিল। সে সময় প্রায় প্রতিদিনই নানান ধরনের দুঃসংবাদ আসতো। উমুক গোত্র বিরূপ হয়ে গেছে। মুসলমানদের সাথে এক নাগাড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল। তাদের প্রচারকদেরকে দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিয়ে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হতো। মদীনার বাইরে তাদের জানমালের কোন নিরাপত্তা ছিল না। এ অবস্থায় এসব বিপদের ঢেউয়ের আঘাতে যাতে ইসলামের তরী ডুবে না যায় **সেজন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটি জোরদার প্রচেষ্টা ও জীবন উৎসর্গকারী সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন ছিল।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ৩৭

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৭২

আর তোমাদের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে **যে শৈথিল্য করে;** অনন্তর যদি তোমাদের উপর বিপদ নিপতিত হয় তাহলে বলেঃ আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল যে, আমি তখন তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না।

তাফসীর বলে

এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, **নিজে তো গড়িমসি করেই এমন কি অন্যদেরকে ও হিম্মতহারা করে দেয়, তাদের বুকে ভয় ঢুকিয়ে দেয় এবং জিহাদ বন্ধ করার জন্য এমন ধরনের কথা বলতে থাকে যার ফলে তারা নিজেদের জায়গায় চুপচাপ বসে থাকে।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ৩৮

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৭৪

সুতরাং **যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করুক এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, অতঃপর সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, অচিরেই আমি তাকে মহা প্রতিফল দান করব।**

তাফসীর বলে

অর্থাৎ **আল্লাহর পথে লড়াই করা দুনিয়ার লাভ ও দুনিয়ার স্বার্থ পূজারী লোকদের কাজ নয়।** এটা এমন এক ধরনের লোকের কাজ যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখে এবং নিজেদের পার্থিব প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির সমস্ত সম্ভাবনা ও সব ধরনের পার্থিব স্বার্থ **একমাত্র আল্লাহর জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।** তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাদের রব যেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং এই দুনিয়ায় তাদের ত্যাগ কুরবানী বিফল হয়ে গেলেও আখেরাতেও যেন বিফল না যায়।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৩৯

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৭৫

তোমাদের কি হয়েছে যে, **তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছনা?** অথচ নারী, পুরুষ এবং শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা বলেঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে অত্যাচারী এই নগর হতে নিস্কৃতি দিন এবং স্বীয় সন্নিধান হতে আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও নিজের নিকট হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন।

তাফসীর বলে

এখানে এমন সব মজলুম শিশু, নারী ও পুরুষদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যারা মক্কায় ও আরবের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের হিজরত করার শক্তি ছিল না এবং নিজেদেরকে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করার ক্ষমতাও ছিল না। এদের ওপর বিভিন্ন প্রকার জুলুম

চালানো হচ্ছিল । **কেউ এসে তাদেরকে এই জুলুমের সাগর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, এই ছিল তাদের দোয়া ও প্রত্যাশা।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ৪০

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৭৬

যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।

তাফসীর বলে

এটি আল্লাহর একটি দ্ব্যর্থহীন ফায়সালা। আল্লাহর পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করা হচ্ছে ঈমানদারদের কাজ। যথার্থ ও সত্যিকার মুমিন এই কাজ থেকে কখনো বিরত থাকবে না। আর আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহ বিরোধী ও আল্লাহদ্রোহীদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাগুতের পথে লড়াই করা হচ্ছে কাফেরদের কাজ । কোন ঈমানদার ব্যক্তি এ কাজ করতে পারে না। অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে শয়তান ও তার সাথীরা বিরাট প্রস্তুতি এগিয়ে আসে এবং জবরদস্ত কৌশল অবলম্বন করে কিন্তু তাদের প্রস্তুতি ও কৌশল দেখে ঈমানদারদের ভীত হওয়া উচিত নয় অবশ্যি তাদের সকল প্রস্তুতি ও কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৪১

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৭৭

তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? **অতঃপর যখন তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ দেয়া হল,** তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, **কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলে!** আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসূল)

তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না।

তাফসীর বলে

এই আয়াতটির তিনটি অর্থ হয়। এই তিনটি অর্থই তাদের নিজস্ব পরিসরে যথার্থ ও নির্ভুলঃ

এর একটি অর্থ হচ্ছে, প্রথমে লোকেরা নিজেরাই যুদ্ধ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। বারবার বলতোঃ আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে। নিপীড়ন নির্যাতন চালানো হচ্ছে। মারপিট করা হচ্ছে । গালি গালাজ করা হচ্ছে। আমরা আর কতদিন সবর করবো। আমাদের মোকাবিলা করার অনুমতি দেয়া হোক। সে সময় তাদেরকে বলা হতো, সবর করো এবং নামায ও যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধন করতে থাকো। তখন এই সবর ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করার হুকুম পালন করা তাদের জন্য বড়ই কষ্টকর হতো। কিন্তু এখন লড়াই করার হুকুম দেবার পর সেই লড়াইয়ের দাবীদারদের একটি দল শত্রুদের সংখ্যা ও যুদ্ধের বিপদ দেখে আতংকিত হয়ে পড়েছিল ।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, **যতদিন নামায, রোযা এবং এই ধরনের নির্ঝনঝাট ও ঝুঁকিহীন কাজের হুকুম ছিল এবং যুদ্ধ করে প্রাণ দান করার প্রশ্ন সামনে আসেনি ততদিন এরা খাঁটি দীনদার ও ঈমানদার ছিল। কিন্তু এখন সত্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার কাজ শুরু হতেই এরা ভীত ও আতংকিত হয়ে পড়েছে।**

এর তৃতীয় অর্থটি হচ্ছে, **প্রথমে তো লুটপাট করার ও নিজের স্বার্থোদ্ধারের লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য তাদের তরবারী সবসময় কোষমুক্ত থাকতো এবং রাতদিন যুদ্ধ-বিগ্রহই ছিল তাদের কাজ।** সে সময় তাদেরকে রক্তপাত থেকে বিরত রাখার জন্য নামায ও যাকাতের মাধ্যমে নফসের সংশোধন করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। আর এখন আল্লাহর জন্য তলোয়ার ওঠাবার হুকুম দেবার পর দেখা যাচ্ছে, যারা স্বার্থোদ্ধারের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সিংহ ছিল আল্লাহর জন্য লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তারা হয়ে গেছে বুজদিল কাপুরুষ। নফ্স ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে হাতে ইতিপূর্বে তরবারী ঝলসে উঠেছিল, আল্লাহর পথে তরবারী চালাবার প্রশ্নে সে হাত নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৪২

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৮৪

কাজেই আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে, মু'মিনদের উদ্বুদ্ধ কর, হতে পারে যে আল্লাহ কাফিরদের শক্তি সংযত করবেন এবং আল্লাহ শক্তিতে অতি প্রবল, শাস্তিদানে অতি কঠোর।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৪৩

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৮৯

তারা আকাঙ্ক্ষা করে যে, তারা নিজেরা যেমন কুফরী করেছে, তোমরাও তেমনি কুফরী কর, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত তারা আল্লাহর পথে হিজরত না করে। **যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে গ্রেফতার কর এবং যেখানেই তাদেরকে পাও, হত্যা কর।** তাদের মধ্য হতে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী গ্রহণ করো না।

তাফসীর বলে

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফের জাতিদের সাথে যেসব মুনাফিক মুসলমান সম্পর্ক রাখে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও শত্রুতামূলক কার্যকলাপে কার্যত অংশগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে এই নির্দেশটি দেয়া হয়েছে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৪৪

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৯০

কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। **অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ তোমাদের কে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি।**

তাফসীর বলে

এখানে আওতাভুক্ত না করার যে নির্দেশটি জারি করা হয়েছে তার সম্পর্ক "তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজেদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না" বাক্যটির সাথে নয়। **বরং এর সম্পর্ক হচ্ছে" তাদেরকে যেখানেই পাও ধরো এবং হত্যা কারো" বাক্যটির সাথে। এর অর্থ হচ্ছে, যেসব মুনফিককে হত্যা করা ওয়াজিব,** তারা যদি এমন কোন জাতির এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেয় যাদের সাথে ইসলামী

রাষ্ট্রের চুক্তি রয়েছে, তাহলে সেই রাষ্ট্রের সীমানায় প্রবেশ করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না। আর দারুল ইসলামের কোন মুসলমান কোন নিরপেক্ষ দেশের এলাকায় যদি এমন কোন মুনাফিককে পায় যাকে হত্যা করা ওয়াজিব এবং তাকে হত্যাও করে ফেলে, তাহলে এটাও কোনক্রমে বৈধ হবে না। এখানে আসলে মুনাফিকদের রক্তের প্রতি নয় বরং চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনই লক্ষ্য।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৪৫

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৯১

অচিরেই তোমরা কতক লোককে এমনও পাবে, যারা তোমাদের কাছ থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়, তাদের নিজ সম্প্রদায় থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়, যখন তাদেরকে ফিতনার দিকে মনোনিবেশ করানো হয় তখন তাতেই জড়িয়ে পড়ে। কাজেই যদি তারা তোমাদের শত্রুতা হতে সরে না যায় এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে, তবে **তাদেরকে গ্রেফতার কর আর যেখানেই পাও হত্যা কর,** এরাই হচ্ছে সেই সব লোক তোমাদেরকে যাদের বিরুদ্ধাচরণের স্পষ্ট অধিকার দিয়েছি।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৪৬

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৯৪

হে মু'মিনগণ! **যখন তোমরা আল্লাহর পথে (যুদ্ধে) যাত্রা করবে** তখন কে বন্ধু আর কে শত্রু তা পরীক্ষা করে নেবে, কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে বলো না, 'তুমি মু'মিন নও', তোমরা ইহজগতের সম্পদের আকাঙ্ক্ষা কর, বস্তুতঃ **আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য প্রচুর গনীমত আছে।** তোমরাও এর পূর্বে এ রকমই ছিলে (অর্থাৎ তোমারাও তাদের মতই তোমাদের ঈমানকে তোমাদের কওম থেকে গোপন করতে), তৎপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপা করেছেন, কাজেই অগ্রে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে নিবে; তোমরা যা কিছু কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর বলে

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে 'আসসালামু আলাইকুম' বাক্যটি মুসলমানদের জন্য । ঐতিহ্য ও পরিচিতির প্রকাশ ছিল। একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে দেখলে এ বাক্যটি ব্যবহার করতো এই অর্থে, ''আমিও তোমার দলভুক্ত, তোমার বন্ধু ও শুভাকাংখী। আমার কাছে তোমার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। কাজেই তুমি আমার সাথে শত্রুতা করো না এবং আমার পক্ষ থেকেও তোমার জন্য শত্রুতা ও ক্ষতির কোন আশংকাই নেই।'' **সেনাবাহিনীর মধ্যে যেমন সাংকেতিক শব্দ (Password) হিসেবে একটি শব্দ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং রাতে এক সেনাবাহিনীর লোক অন্য সেনাবাহিনীর কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় এই শব্দ ব্যবহার করে যাতে সে শত্রু সেনাবাহিনীর লোক নয় একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তেমনি সালাম শব্দটিকেও মুসলমানদের মধ্যে সাংকেতিক শব্দ হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।** বিশেষ করে সেই সময় এই সাংকেতিক শব্দটি ব্যবহারের গুরুত্ব আরো বেশী ছিল এজন্য যে, সে সময় আরবের নওমুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে পোশাক, ভাষা বা অন্য কোন জিনিসের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল না। ফলে একজন মুসলমানের পক্ষে প্রথম দৃষ্টিতে অন্য একজন মুসলমানকে চিনে নেয়া খুব কঠিন ছিল।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াতো আরো জটিল। মুসলমানরা যখন কোন শত্রুদলের ওপর আক্রমণ করতো এবং সেখানের কোন মুসলমান তাদের তরবারীর নীচে এসে যেতো তখন আক্রমণকারী মুসলমানদেরকে সে জানাতে চাইতো, আমি তোমাদের দীনী ভাই। একথা জানাবার জন্য সে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে চীৎকার করে উঠতো। কিন্তু মুসলমানরা তাতে সন্দেহ করতো। তারা মনে করতো, এ ব্যক্তি কোন কাফের, নিছক নিজের জান বাঁচাবার জন্য সে এই কৌশল অবলম্বন করেছে। এজন্য অনেক সময় তার এ ধরনের লোককে হত্যা করে বসতো এবং তার মালমাত্তা গণীমাত হিসেবে লুট করে নিতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ধরনের ব্যাপারে প্রতি ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে তিরস্কার ও শাসন করেছেন। কিন্তু তবুও এ ধরনের দুর্ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ কুরআন মজীদে এই সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন।

এখানে এই আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পেশ করেছে তার ব্যাপারে তোমাদের এ ধরনের হালকাভাবে ফায়সালা করার কোন অধিকার নেই যে, সে নিছক প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিথ্যা বলছে। সে সত্যবাদীও হতে পারে, মিথ্যাবাদীও হতে পারে । প্রকৃত সত্য তো জানা যাবে অনুসন্ধানের পর। অনুসন্ধান ছাড়াই তাকে ছেড়ে দেবার ফলে যদি একজন কাফেরের মিথ্যা বলে প্রাণ বাঁচাবার সম্ভাবনা থাকে, **তাহলে তাকে হত্যা করার পরে তোমাদের হাতে একজন নিরপরাধ মু'মিনের মারা পড়ারও সম্ভাবনা থাকে।** কাজেই ভুলবশত একজন কাফেরকে ছেড়ে দেয়া ভুলবশত মু'মিনকে হত্যা করার চেয়ে অনেক ভালো।

অর্থাৎ তোমাদেরও এমন এক সময় ছিল যখন তোমরা কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলে। জুলুম নির্যাতনের ভয়ে ইসলামের কথা বাধ্য হয়ে গোপন রাখতে। ঈমানের মৌখিক অংগীকার ছাড়া

তোমাদের কাছে তার আর কোন প্রমাণ ছিল না । এখন আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা সামাজিক জীবন যাপনের সুবিধে ভোগ করছো। তোমরা এখন কাফেরদের মোকাবিলায় ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার যোগ্যতা লাভ করেছো। কাজেই যেসব মুসলমান এখনো প্রথম অবস্থায় আছে তাদের ব্যাপারে কোমল ব্যবহার ও সুবিধাদানের নীতি অবলম্বন না করলে তোমাদেরকে যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৪৭

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৯৫

অক্ষম নয় এমন বসে-থাকা মু'মিনরা আর **জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণ সমান নয়;** নিজেদের ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদকারীদেরকে বসে-থাকা লোকেদের উপর আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ সকলের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন এবং মুজাহিদদেরকে বসে-থাকা লোকেদের তুলনায় আল্লাহ মহাপুরস্কার দিয়ে মর্যাদা দান করেছেন।

তাফসীর বলে

জিহাদের নির্দেশ জারী করার পর যারা টালবাহানা করে বসে থাকে অথবা জিহাদের জন্য সাধারণভাবে ঘোষণা দেবার এবং জিহাদ করা 'ফরযে আইন' হয়ে যাবার পরও যারা লড়াই করতে গড়িমসি করে তাদের কথা বলা হয়নি। বরং এমন সব লোকের কথা বল হয়েছে যারা জিহাদ করা যখন 'ফরযে কিফায়া' সে অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে যাবার পরিবর্তে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রথম দু'টি অবস্থায় জিহাদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ময়দানে যেতে বিরত থাকলে একজন মুসলমান কেবল মুনাফিকই হতে পারে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য কল্যাণ ও নেকীর কোন ওয়াদা নেই। তবে যদি সে কোন যথার্থ অক্ষমতার শিকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। বিপরীত পক্ষে শেষোক্ত অবস্থায় ইসলামী জামায়তের সমগ্র সমরশক্তির প্রয়োজন হয় না। বরং তার একটি অংশের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় যদি ইমামের পক্ষ থেকে এই মর্মে ঘোষণা দেয়া হয় যে, উমুক অভিযানে যারা অংশ গ্রহণ করতে চায় তারা অন্যান্য কল্যাণকর কাজে যারা ব্যস্ত থাকবে তাদের তুলনায় অবশ্যি উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৪৮

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১০০

যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

তাফসীর বলে

এখানে একথা বুঝতে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের ওপর ঈমান এনেছে তার জন্য কুফরী জীবন ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করা কেবল মাত্র দু'টি অবস্থায় বৈধ হতে পারে। এক, সে ইসলামকে সে দেশে বিজয়ী করার ও কুফরী জীবন ব্যবস্থাকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকবে যেমন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁর প্রাথমিক অনুসারী বৃন্দ চালিয়ে এসেছেন। দুই, সে আসলে সেখান থেকে বের হয়ে আসার কোন পথ পায়নি, তাই চরম ঘৃণা, অনিচ্ছা ও অসন্তুষ্টি সহকারে বাধ্য হয়ে সেখানে অবস্থান করবে। এই দু'টি অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় দারুল কুফরে অবস্থান করা একটি স্থায়ী গোনাহের শামিল। আর এই গোনাহের সপক্ষে এই ধরনের কোন ওজর পেশ করা যে, এই দুনিয়ায় আমরা হিজরাত করে গিয়ে অবস্থান করতে পারি এমন কোন দারুল ইসলাম পাইনি আসলে মোটেই কোন গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ওজর বলে বিবেচিত হবে না। যদি কোন দারুল ইসলাম না থেকে থাকে তাহলে কি আল্লাহর এই বিস্তৃত পৃথিবীতে এমন কোন পাহাড় বা বন জংগলও ছিল না যেখানে আশ্রয় নিয়ে মানুষ গাছের পাতা খেয়ে ও ছাগলের দুধপান করে জীবনধারণ করতে পারতো এবং কুফরী জীবনবিধানের আনুগত্য থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হতো ।

''লা হিজরাতা বা'দাল ফাত্‌হে'' –মক্কা বিজয়ের পর এখন আর কোন হিজরাত নেই –এই হাদীসটি থেকে অনেকে ভুল ধারণা নিয়েছেন। অথচ এ হাদীসটি কোন চিরন্তন হুকুম নয়। বরং সে সময়ের অবস্থা ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আরবদেরকে একথা বলা হয়েছিল। যতদিন আরবের অধিকাংশ এলাকা দারুল হারব ও দারুল কুফরের অন্তরভুক্ত ছিল এবং কেবলমাত্র মদীনায় ও মদীনার আশেপাশে ইসলামের বিধান জারী হচ্ছিল, ততদিন মুসলমানেদের বাধ্যতামূলকভাবে হুকুম দেয়া হয়েছিল যে, চর্তুদিক থেকে এসে তাদের দুরুল ইসলামে একত্র হতে হবে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর আরবে যখন কুফরী শক্তি ভেঙে পড়লো এবং প্রায় সমগ্র দেশ ইসলামী ঝান্ডার অধীন হলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এখন আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। তার এ বক্তব্যের অর্থ এ নয় যে,

সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য সর্ব অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত হিজরাত ফরয হবার বিধান বাতিল হয়ে গেছে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৪৯

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১০১

আর যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর তখন সালাত সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, যারা অবিশ্বাসী তারা তোমাদেরকে বিব্রত করবে; **নিশ্চয়ই কাফিরেরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।**

তাফসীর বলে

যেসব ওয়াক্তে চার রাকআত নামায ফরয সেসব ওয়াক্তে ফরয নামায দুই রাকআত পড়াই হচ্ছে শান্তির সময়ের সফরের কসর। **আর যুদ্ধের সময়ে কসর করার ব্যাপারে কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। যুদ্ধের অবস্থায় যেভাবে সম্ভব নামায পড়ে নিতে হবে।** জামায়াতে পড়ার সুযোগ থাকলে জামায়াতে পড়ে নিতে হবে। অন্যথায় ব্যক্তিগতভাবে একা একা পড়ে নিতে হবে। **কিবলার দিকে মুখ করে পড়া সম্ভব না হলে যে দিকে মুখ করে পড়া সম্ভব সেদিকে মুখ করে পড়তে হবে। সাওয়ারীর পিঠে বসে চলন্ত অবস্থায়ও পড়া যেতে পারে। রুকূ' ও সিজদা করা সম্ভব না হলে ইশারায় পড়তে হবে। প্রয়োজন হলে নামায পড়া অবস্থায় হাঁটতেও পারে। কাপড়ে রক্ত লেগে থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। এতো সব সহজ ব্যবস্থার পরও যদি অবস্থা এতই বিপদজ্জনক হয়, যার ফলে নামায পড়া সম্ভবপর না হয়ে থাকে, তাহলে বাধ্য হয়ে নামায পিছিয়ে দিতে হবে। যেমন খন্দকের যুদ্ধের সময় হয়েছিল।**

সফরে কি কেবল ফরয পড়া হবে, না সুন্নতও পড়া হবে- এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু প্রমানিত তা হচ্ছে এই যে, তিনি সফরে ফজরেরর সুন্নাত ও এশার বেতের নিয়মিত পড়তেন কিন্তু অন্যনান ওয়াক্তে কেবল ফরয পড়তেন। নিয়মিত সুন্নাত পড়া তাঁর থেকে প্রমাণিত হয়নি। তবে নফল নামাযের যখনই সুযোগ পেতেন পড়ে নিতেন। এমনকি সাওয়ারীর পিঠে বসেও নফল নামায পড়তেন। এজন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) লোকদের সফরে ফজর ছাড়া অন্য ওয়াক্তে সুন্নাতগুলো জায়েয গণ্য করেছেন এবং অধিকাংশ উলামা সুন্নত ও নফল পড়া বা না পড়া উভয়টি জায়েয গন্য করেছেন এবং ব্যক্তি ইচ্ছার ওপর তা ছেড়ে দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের সর্বজন গৃহীত মতটি হচ্ছে, মুসাফির যখন পথে চলমান অবস্থায় থাকে তখন তার সুন্নাত না পড়াই উত্তম আর যখন কোন স্থানে অবস্থান করতে থাকে এবং সেখানে নিশ্চিন্ত পরিবেশ বিরাজ করে, সে ক্ষেত্রে সুন্নাত পড়াই উত্তম।

যে সফরে কসর করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কোন কোন ইমাম শর্ত আরোপ করেছেন যে, তা হতে হবে ফী সাবীলিল্লাহ- আল্লাহর পথে। **যেমন জিহাদ, হজ্জ, উমরাই ইসলামী জ্ঞান আহরণ ইত্যাদি।** ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও আতা এরি ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বলেন, সফল এমন কোন উদ্দেশ্যে হতে হবে যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয। হারাম ও নাজায়েয উদ্দেশ্য সামনে রেখে যে সফর করা হয় তাতে কসরের অনুমতির সুবিধা ভোগ করার অধিকার কারোর নেই। হানাফীদের মতে যে কোন সফরে কসর করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সফরের ধরণ সম্পর্কে বলা যায়, তা নিজেই সওয়াব বা আযাবের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু কসরের অনুমতির ওপর তার কোন প্রভাব পড়ে না। কোন কোন ইমাম "কোন ক্ষতি নেই" বাক্যটি থেকে এ অর্থ নিয়েছেন যে, সফরে কসর করা জরুরী নয়। বরং সফরে কসরের নিছক অনুমতিই দেয়া হয়েছে। ব্যক্তি চাইলে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে আবার চাইলে পুরো নামায পড়তে পারে। ইমাম শাফেঈ এ মতটি গ্রহণ করেছেন, যদিও তিনি কসর করাকে উত্তম এবং কসর না আসে উত্তম কাজ ত্যাগ করার অন্তরভুক্ত করেছেন। ইমাম আহমাদের মতে কসর করা ওয়াজিব। একটি বর্ণনা মতে ইমাম মালিকেরও এই একই মত উদ্ধৃত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামেশা সফরে কসর করেছেন, এটা হাদীস থেকে প্রমাণিত। কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি সফরে কখনো চার রাকাআত ফরয পড়েছেন। ইবনে উমর বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমর, ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুমের সাথে সফর করেছি। আমি কখনো তাদের সফরে কসর না করতে দেখিনি। এরি সমর্থনে ইবনে আব্বাস এবং আরো অসংখ্য সাহাবীর নির্ভরযোগ রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত উসমান যখন হজ্জের সময় মীনায় চার রাকাআত পড়ালেন তখন সাহাবীগণ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। হযরত উসমান তখণ এই জবাব দিয়ে লোকদের নিশ্চিন্ত করলেন: আমি মক্কায় বিয়ে করেছি আর যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন শহরে পারিবারিক জীবন শুরু করে সে যেন সেই শহরের অধিবাসী। তাই আমি এখানে কসর করিনি এই রেওয়ায়াতগুলোর বিরুদ্ধে হযরত আয়েশা থেকে এমন দু'টি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, কসর করা বা পূর্ণ নামায পড়া উভয়টিই ঠিক কিন্তু এই রেওয়ায়াতগুলো সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হবার সাথে সাথে হযরত আয়েশার (রা) নিজের থেকে প্রমাণিত মতেরও বিরোধী । তবে একথা সত্য যে, সফরে ও অ-সফরের মাঝামাঝি একটি অবস্থা রয়েছে। সে অবস্থায় একই অস্থায়ী নিবাসে সুবিধা মতো কখনো কসর করা যেতে পারে আবার কখনো পুরো নামায পড়ে নেয়া যেতে পারে। সম্ভবত হযরত আয়েশা (রা) এই অবস্থাটি সম্পর্কে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে কসর করেছেন আবার পুরো নামাযও পড়েছেন। আর কুরআনের এই "সফরে কসর করলে ক্ষতি নেই" বাক্যটি এ ক্ষেত্রে কোন নতুন কথা নয়। ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ১৯ রুকু'তেও সাফা ও মারাওয়া পাহাড় দু'টির মাঝখানে 'সাঈ' করার নির্দেশও এই একই ভাষায় দেয়া হয়েছে অথচ এই 'সাঈ' 'মানাসিকে হজ্জ' অর্থাৎ হজ্জ এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর অন্তরভূক্ত

এবং ওয়াজিব। আসলে এই উভয় স্থানেই লোকদের মনের একটা আশংকা দূর করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। সেই আশংকাটি ছিল এই যে, এ ধরনের কাজে কোন গোনাহ হবে নাতো বা এতে সওয়াবে কোন কমতি দেখা দেবে না তো! এ ধরনের আশংকা দূর করার উদ্দেশ্যই এ স্থানে এ বর্ণনাভংগী গ্রহণ করা হয়েছে।

কি পরিমাণ দূরত্বের সফল হলে তাতে কসর করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে 'যাহেরী ফিকাহ'-এর মত হচ্ছে এর কোন পরিমাণ নেই। কম বা বেশী যে কোন দূরত্বের সফল হোক না কেন তাতে কসর করা যেতে পারে। ইমাম মালিকের মতে ৪৮ মাইল বা এক দিন রাতের কম সময়ের সফরে কসর নেই। ইমাম আহমাদও একই মত পোষন করেন। ইবনে আব্বাসও (রা) এই মত পোষণ করতেন। ইমাম শাফেঈর একটি বিবৃতিতে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হরত আনাস (রা) ১৫ মাইলের সফরে কসর কায়েয মনে করেন। ''একদিনের সফর কসর করার জন্য যথেষ্ট" হযরত উমরের (রা)) এই মত ইমাম আওয়াযী ও ইমাম যুহ্‌রী গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী দুই দিন এবং ইমাম আবু ইউসুফ দুই দিনের বেশী দুরত্বের সফরে কসর জায়েয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে পায়ে হেঁটে বা উটের পিঠে চড়ে তিন দিন সফল করে যে দুরত্ব অতিক্রম করা যা(অর্থাৎ প্রায় ১৮ ফরসঙ্গ বা ৫৪ মাইল) তাতে কসর করা যেতে পারে। ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও হযরত উসমান রাদি আল্লাহু আনহুম এই মত পোষণ করেন।

সফরের মাঝখানে কোথাও অবস্থান করলে কতদিন পর্যন্ত কসর করা যেতে পারে-এ ব্যাপারেও ইমামগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম আহমাদের মতে যেখানে ৪ দিন অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে সেখানে পুরা নামায পড়তে হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম সাফেঈর মতে যেখানে ৪ দিনের বেশী সময় অবস্থানের নিয়ত করলে পুরা নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়নি। আর যদি কোন স্থানে এক ব্যক্তি বাধ্য হয়ে আটকে পড়ে এবং সবসময় তার খেয়াল থাকে যে, বাধা দূর হলেই সে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হবে, তাহলে এমন স্থানে সে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কসর করতে থাকবে। এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত। সাহাবায়ে কেরামদের থেকে এমন অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে জানা যায়, তাঁরা এ ধরনের অবস্থায় দুই দুই বছর পর্যন্ত অনবরত কসর করেছেন। এরি ওপর কিয়াস করে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল কয়েদীকেও তার সমগ্র ব্যাপী কসর করার অনুমতি দিয়েছেন।

'যাহেরী' ও 'খারেজী' ফিকাহর অনুসারীরা এ বাক্যের যে অর্থ গ্রহণ করে থাকে তা হচ্ছে, কসর কেবল যুদ্ধাবস্থার জন্য আর শান্তির অবস্থায় যে সফর করা হয় তাতে কসর করা কুরআন বিরোধী। কিন্তু নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতের মাধ্যমে হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা) এই একই সন্দেহটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সামনে পেশ করলে তিনি এর জবাবে বলেন: -- অর্থাৎ ''এই নামাযে কসর করার অনুমতিটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পুরস্কার।আল্লাহ তোমাদের

এই পুরস্কার দান করেছেন। কাজেই তোমরা এ পুরস্কারটি গ্রহণ করো"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তি ও ভয় উভয় অবস্থায়ই সফরের নামযে কসর করেছেন। একথা প্রায় 'মুতাওয়াতির' বা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত হাদীসের মধ্যমে প্রমাণিত সত্য। ইবনে আব্বাস (রা) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন:

অর্থাৎ ''নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা থেকে মক্কার দিকে বের হলেন। সে সময় একমাত্র রবুল আলামীন ছাড়া আর কারোর ভয় ছিল না। কিন্তু তিনি নামায দুই রাকআত পড়লেন"। এজন্য আমি তরজমায় বন্ধনীর মধ্যে ''বিশেষ করে" শব্দটি বাড়িয়ে দিয়েছি

জিহাদ ও আক্রমণ: ৫০

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১০২

এবং যখন তুমি মু'মিনদের মাঝে অবস্থান করবে আর তাদের সঙ্গে নামায কায়িম করবে তখন তাদের একটি দল যেন **তোমার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং সশস্ত্র থাকে,** তাদের সাজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের পশ্চাতে অবস্থান করে এবং অপর যে দলটি নামায আদায় করেনি তারা যেন তোমার সঙ্গে নামায আদায় করে এবং **সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে;** কাফিরগণ কামনা করে যে, তোমরা যেন **তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামের ব্যাপারে অসতর্ক হও, যাতে তারা একজোটে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।** যদি তোমাদের বৃষ্টির কারণে কষ্ট হয়, কিংবা তোমরা পীড়িত হও, তবে অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ কাফিরদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

তাফসীর বলে

ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান বিন যিয়াদ এই শব্দাবলী থেকে এ ধারণা নিয়েছেন যে, "সালাতে খওফে"র (ভয়ের নামায) কেবলমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে একটি হুকুম দেয়া হয়েছে আবার সেই হুকুমটিই তাঁর পরে তার স্থলাভিষিক্তদের জন্যও আগের মতই কার্যকর রয়েছে, কুরআন মজীদে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাজেই "সালাতে খওফ"কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নির্দিষ্ট করার কোন কারণে নেই। এছড়াও অসংখ্য নেতৃস্থানীয় সাহাবী থেকেও একথা প্রমণাতি হয়েছে যে, তাঁরা নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেও 'সালাতে খওফ' পড়েছেন। এ প্রশ্নে কোন সাহাবীর মতবিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

শত্রুর আক্রমণের ভয় আছে কিন্তু কার্যত লড়াই হচ্ছে না, এমন অবস্থায় 'সালাতে খওফে'র (ভয়ের নামায) হুকুম দেয়া হয়েছে। আর কার্যকত যখন লড়াই চলছে তেমন অবস্থায় হানাফীদের মতে নামায পিছিয়ে দেয়া হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম সুফিয়ান সওরীর মতে রুকু' ও সিজদা করা সম্ভব না হলে ইশারায় নামায পড়ে নিতে হবে। ইমাম শাফেঈর মতে, নামাযের মধ্যেও কিছুটা যুদ্ধ করা যেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের সময় চার ওয়াক্তের নামায পড়েননি। তারপর সুযোগ পেয়েই তরতীব অনুযায়ী চার ওয়াক্তের নামা এক সাথে পড়ে নেন। অথচ খন্দকের যুদ্ধের আগেই 'সালাতে খওফে'র হুকুম এসে গিয়েছিল।

অনেকটা যুদ্ধের অবস্থার ওপর 'সালাত খওফ' পড়ার পদ্ধতি নির্ভর করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন অবস্থায় পদ্ধতি এ নামায পড়িয়েছেন। কাজেই যুদ্ধের অবস্থা বা পরিস্থিতি ঐ পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে যেটির অনুমতি দেবে তৎকালীন ইসলামী দলের প্রধান সেই পদ্ধতিতেই নামায পড়াবেন।

এর একটি পদ্ধতি হচ্ছে: সেনাদলের একটি অংশ ইমামের সাথে নামায পড়বে এবং অন্য অংশটি তখন দুশমেনর মোকাবিলা করতে থাকবে। যখন এক রাকআত পুরা হয়ে যাবে তখন প্রথম অংশটি সালাম ফিরে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় অংশটি এসে ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকআতটি পুরা করবে। এভাবে ইমামের দু'রাকআত এবং সৈন্যদের এক রাকআত নামায হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে: সেনাদলের এক অংশ ইমামের সাথে এক রাকআত পড়ে চলে যাবে তারপর দ্বিতীয় অংশটি এসে ইমামের পেছনে এক রাকআত পড়বে। এরপর উভয় অংশই পালাক্রমে এসে নিজেদের বাকি এক রাকআত একা একা পড়ে নেবে। এভাবে উভয় অংশের এক রাকআত পড়া হবে ইমামের পিছনে এবং এক রাকআত হবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে।

এর তৃতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে: ইমামের পেছনে সেনাদলের একটি অংশ দুই রাকআত পড়েব এবং তাশাহ্হুদের পর সালাম ফিরে চলে যাবে। সেনাদলের দ্বিতীয় অংশ ইমামের সাথে তৃতীয় রাকআতে শরীক হবে এবং তার সাথে আর এক রাকআত করে পড়ে সালাম ফিরবে। এভাবে ইমামের চার ও সেনাদলের দুই রাকআত হবে।

চতুর্থ পদ্ধতিটি হচ্ছে: **সেনাদলের এক অংশ ইমামের সাথে এক রাকআত পড়বে এই ইমাম যখন দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে তখন মুকতাদীরা নিজেরাই একা একা দ্বিতীয় রাকআত তাশাহহুদ সহ পড়ে সালাম ফিরে চলে যাবে।** তারপর দ্বিতীয় অংশটি এসে এমন অবস্থায় ইমামের সাথে শামিল হবে যে ইমাম তখনো দ্বিতীয় রাকআতে থাকবেন এবং এরা বাকি নামায ইমামের সাথে পড়ার পর এক রাকআত নিজেরা উঠে একা একা পড়ে নেবে। এ অবস্থায় ইমামকে দ্বিতীয় রাকআতে দীর্ঘতম কিয়াম করতে হবে।

ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহু ও মুজাহিদ প্রথম পদ্ধতিটি সম্পর্কে রেওয়ায়াত করেছেন। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সম্পর্কে রেওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হানাফীগণ এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তৃতীয় পদ্ধতিটি রেওয়ায়াত করেছেন হাসান বসরী আবু বাকরাহ থেকে। আর চতুর্থ পদ্ধতিটিকে সামান্য একটু মতবিরোধ সহকারে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মালেক অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর উৎস হচ্ছে সাহ্‌ল ইবনে আবী হাস্‌মার একটি রেওয়ায়াত। এগুলো ছাড়া সালাতে খওফের আরো কয়েকটি পদ্ধতি আছে। ফিকাহর কিতাবগুলোয় এগুলোর আলোচনা পাওয়া যাবে।

অর্থাৎ তোমাদের এই যে সতর্কতার হুকুম দেয়া হচ্ছে এটা নিছক একটা পার্থিব কৌশল। নয়তো আসলে জয়-পরাজয় তোমাদের কৌশলের ওপর নির্ভর করে না। বরং তা নির্ভর করে আল্লাহর ফায়সালার ওপর। তাই এই সতর্কতামূলক কৌশল ও পদক্ষেপগুলো কার্যকর করার সময় তোমাদের একথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, যারা নিজেদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিবিয়ে দিতে চাচ্ছে আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করবেন।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৫১

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১০৩

যখন তোমরা নামায আদায় করে নেবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে, অতঃপর যখন **তোমরা নিরাপদ হবে তখন (যথানিয়মে) নামায কায়িম করবে।** নির্দিষ্ট সময়ে নামায কায়িম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৫২

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১০৪

এ (শত্রু) কওমের পশ্চাদ্ধাবণে দুর্বলতা দেখাবে না, কেননা যদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তোমাদের মত তারাও তো কষ্ট পায়, আর তোমরা আল্লাহ হতে এমন কিছু আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ কাফের দল। এ দলটি সে সময় ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অর্থাৎ কাফেররা বাতিলের জন্য যে পরিমান কষ্ট স্বীকার করছে ঈমানদাররা যদি হকের জন্য অন্তত এতটুকু কষ্টও বরদাশ্‌ত করতে না পারে তাহলে তা হবে সত্যিই বিস্ময়কর। অথচ কাফেরদের সামনে কেবল দুনিয়া ও তার ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নেই। বিপরীতপক্ষে ঈমানদাররা আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু পরওয়ারিদগারের সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও তাঁর চিরন্তন পুরস্কার লাভের আকাংখা পোষণ করে আসছে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৫৩

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১৪১

তারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা) তোমাদের ব্যাপারে ওঁৎ পেতে থাকে, তা**রা আল্লাহর তরফ হতে তোমাদের জয়লাভ হলে বলে আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? আর যদি কাফিরদের কিছু বিজয় ঘটে তখন তারা বলে, আমরা কি তোমাদের উপর বিজয়ী ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মু'মিনদের হতে রক্ষা করিনি?** এমতাবস্থায় আল্লাহ ক্বিয়ামাত দিবসে তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন এবং আল্লাহ কক্ষনো মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে (জয়লাভের) পথ করে দেবেন না।

তাফসীর বলে

এটিই প্রত্যেক যুগের মুনাফিকদের বৈশিষ্ট। মৌখিক স্বীকারোক্তি ও ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে নামমাত্র প্রবেশের মাধ্যমে মুসলমান হিসেবে যতটুকু স্বার্থ ভোগ করা যায় তা তারা ভোগ করে। আবার অন্যদিকে কাফের হিসেবে যে স্বার্থটুকু ভোগ করা সম্ভব তা ভোগ করার জন্য তারা কাফেরদের সাথে যোগ দেয়। তারা সর্বোতভাবে কাফেরদের বিশ্বাসভাজন হবার চেষ্টা করে। তাদেরকে বলে: আমরা মোটেই "গোঁড়া ও বিদ্বেষপরায়ণ" মুসলমান নই। মুসলমাদের সাথে আমাদের অবশ্যি নামের সম্পর্ক আছে কিন্তু আমাদের মানসিক ঝোক, আগ্রহ ও বিশ্বস্ততা রয়েছে তোমাদের প্রতি। চিন্তা –ভাবনা, আচার-ব্যবহার, রুচি-প্রকৃতি ইত্যাদি সবদিক দিয়ে তোমাদের সাথে আমাদের গভীর মিল। **তাছাড়া ইসলাম ও কুফরীর সংঘর্ষে আমরা তোমাদের পক্ষই অবলম্বন করবো।**

অধ্যায়-০৪: সূরা আল মায়িদাহ (০৫) (খাবার টেবিল)

জিহাদ ও আক্রমণ: ৫৪

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ৩৩

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায় তাদের শাস্তি হল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এ হল তাদের জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, আর তাদের জন্য আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি।

তাফসীর বলে

পৃথিবী বলতে এখানে পৃথিবীর সেই অংশ ও অঞ্চল বুঝাচ্ছে যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম করার দায়িত্ব ইসলামী সরকার গ্রহণ করেছে । আর আল্লাহ ও রসূলের সাথে লড়াই করার অর্থ হচ্ছে, ইসলামী সরকার দেশে যে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন করেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা । পৃথিবীতে একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই আল্লাহর ইচ্ছা এবং এ জন্য তিনি নিজের রসূল পাঠিয়েছিলেন । সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে পৃথিবীতে অবস্থানকারী মানুষ, পশু, বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টি শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে, মানবতা তার প্রকৃতির কাংখিত পূর্ণতায় পৌঁছতে সক্ষম হবে এবং পৃথিবীর সমুদয় উপায় উপকরণ এমনভাবে ব্যবহৃত হবে যার ফলে সেগুলো মানবতার ধ্বংস ও বিলুপ্তির নয় বরং তার উন্নতির সহায়ক হবে । এ ধরনের ব্যবস্থা কোন ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে নষ্ট করার প্রচেষ্টা চলানো, তা ক্ষুদ্র পরিসরে হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদির পর্যায়ে চাপানো হোক অথবা আরো বড় আকারে, এ সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে তার জায়গায় কোন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেই চালানো হোক না কেন, তা আসলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবেই বিবেচিত হবে । এটা ঠিক তেমনি যেমন ভারতীয় দণ্ডবিধিতে কোন ব্যক্তির ভারতে

বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা উচ্ছেদের প্রচেষ্টাকে "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"(Waging War Against the king) করার অপরাধে অভিযুক্ত গণ্য করা হয়েছে--সে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোন একজন মামুলি সিপাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু করলেও এবং সম্রাট তার নাগালের বহু দূরে অবস্থান করলেও তার অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না ।

এ বিভিন্ন ধরনের শাস্তির কথা এখানে সংক্ষেপে বলে দেয়া হয়েছে, যাতে করে কাযী বা সমকালীন ইসলামী শাসক নিজের ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রত্যেক অপরাধীকে তার অপরাধের ধরণ ও মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন । আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা প্রকাশ করা যে, ইসলামী হুকুমাতের আওয়তায় বাস করে কোন ব্যক্তির ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা চালানো নিকৃষ্ট ধরনের অপরাধ এবং এ জন্য তাকে উল্লেখিত চরম শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোন শাস্তি দেয়া যেতে পারে ।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৫৫

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ৩৫

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান কর এবং **তাঁর পথে জিহাদ কর** যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ এমন প্রত্যেকটি উপায় অনুসন্ধান করতে থাকো যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে পৌঁছতে পারো।

মূলে (আরবী) "জাহিদু" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে নিছক 'প্রচেষ্টা ও সাধনা' শব্দ দু'টির মাধ্যমে এর অর্থের সবটুকু প্রকাশ হয় না। আর (আরবী) 'মুজাহাদা' শব্দটির মধ্যে মুকাবিলার অর্থ পাওয়া যায়। এর সঠিক অর্থ হচ্ছেঃ যেসব শক্তি আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা তোমাদের আল্লাহর মর্জি অনুসারে চলতে বাধা দেয় এবং তাঁর পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, যারা তোমাদের পুরোপুরি আল্লাহর বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করতে দেয় না এবং নিজের বা আল্লাহর ছাড়া আর কারোর বান্দা হবার জন্য তোমাদের বাধ্য করে, **তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাও**। এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ওপর তোমাদের সাফল্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ নির্ভর করছে।

এভাবে **এ আয়াতটি মুমিন বান্দাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে চতুর্মুখী ও সর্বাত্মক লড়াই করার লড়াই করার নির্দেশ দেয়।** একদিকে আছে অভিশপ্ত ইবলীস এবং তার শয়তানী সেনাদল। অন্যদিকে আছে মানুষের নিজের নফস ও তার বিদ্রোহী প্রবৃত্তি। তৃতীয় দিকে আছে এমন এক আল্লাহ বিমুখ মানব গোষ্ঠী যাদের সাথে মানুষ সব ধরনের সামাজিক, তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা। চতুর্থ দিকে আছে এমন

ভ্রান্ত ধর্মীয় তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যার ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ওপর এবং তা সত্যের আনুগত্য করার পরিবর্তে মিথ্যার আনুগত্য করতে মানুষকে বাধ্য করে। এদের সবার কৌশল বিভিন্ন কিন্তু সবার চেষ্টা একমুখী। এরা সবাই মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে নিজের অনুগত করতে চায়। বিপরীত পক্ষে, মানুষের পুরোপুরি আল্লাহর অনুগত হওয়া এবং ভিতর থেকে বাইর পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহর নির্ভেজাল বান্দায় পরিণত হয়ে যাওয়ার ওপরই তার উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মর্যাদার উন্নীত হওয়া নির্ভর করে। **কাজেই এ সমস্ত প্রতিবন্ধক ও সংঘর্ষশীল শক্তির বিরুদ্ধে একই সাথে সংগ্রামমুখর হয়ে, সবসময় ও সব অবস্থায় তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থেকে এবং এ সমস্ত প্রতিবন্ধককে বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত করে আল্লাহর পথে অগ্রসর না হলে নিজের অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছানো তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ৫৬

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ৮২

তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে **ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে,** আর তন্মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহ্ (খৃষ্টান) বলে; এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু আলিম এবং বহু দরবেশ রয়েছে; আর এ কারণে যে, তারা অহংকারী নয়।

অধ্যায়-০৫: সূরা আল আনফাল (০৮) (যুদ্ধে-লব্ধ ধনসম্পদ)

জিহাদ ও আক্রমণ: ৫৭

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ০১

তারা তোমাকে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল, 'যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের; কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর নিজেদের সম্পর্ককে সুষ্ঠু সুন্দর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কর। তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক তবে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর।'

তাফসীর বলে

এক অদ্ভুত ধরনের ভূমিকা দিয়ে যুদ্ধের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা শুরু করা হয়েছে। বদরের ময়দানে কুরাইশ সেনাদলের কাছ থেকে যে, **গনীমতের মাল লাভ করা হয়েছিল তা বন্টন করার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছিল।** যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করার পর এই প্রথমবার তারা ইসলামের পতাকা তলে লড়াই করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই এ প্রসংগে যুদ্ধ ও যুদ্ধজনিত বিষয়াদিতে ইসলামের বিধান কি তা তাদের জানা ছিল না। সূরা বাকারাহ ও সূরা মুহাম্মাদ কিছু প্রাথমিক নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তখনো কোন সামরিক কৃষ্টি, সভ্যতা ও রীতিনীতির ভিত্তি পত্তন করা হয়নি। আরো বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের ন্যায় মুসলমানরা তখনো পর্যন্ত যুদ্ধের ব্যাপারেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরাতন জাহেলিয়াতের ধারণাই পোষণ করতো। এ কারণে বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পরাজয়ের পর যে ব্যক্তি যে পরিমাণ গনীমতের মাল হস্তগত করেছিল আরবের পুরাতন রীতি অনুযায়ী সে নিজেকে তার মালিক ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় একটি দল গনিমতের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে কাফেরদের পিছনে ধাওয়া করেছিল। তারা এ সম্পদে নিজেদের সমান সমান অংশ দাবী করলো। কারণ তারা বললো, আমরা যদি শত্রুর পেছনে ধাওয়া করে তাদেরকে দুরে ভাগিয়ে দিয়ে না আসতাম এবং তোমাদের মত গনীমতের মাল আহরণ করতে লেগে যেতাম তাহলে শত্রুদের ফিরে এসে পাল্টা হামলা চালিয়ে আমাদের বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে দেবারও সম্ভবনা ছিল। তৃতীয় একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেফাজতে নিয়োজিত ছিল। তারাও নিজেদের দাবী পেশ করলো। তারা বললো, এ যুদ্ধে আমরাই তো সবচেয়ে বেশী মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি। আমরা যদি রসূল (সা) এর চারদিকে মজবুত প্রাচীর গড়ে না তুলতাম এবং আল্লাহ না করুণ! তার ওপর যদি কোন আঘাত আসতো তাহলে বিজয় লাভ করারই কোন প্রশ্ন উঠতো না। ফলে কোন গনীমতের মাল ও লাভ করা যেতো না এবং বন্টন করারও সমস্যা দেখা দিত না । কিন্তু গনিমতের মাল কার্যত যাদের হাতে ছিল তাদের মালিকানার জন্যে যেন কোন প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না। একটি জ্বলজ্যান্ত সত্য যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, যুক্তি প্রমাণের এ অধিকার মানতে তারা প্রস্তুত ছিল না। এভাবে অবশেষে এ **বিবাদ তিক্ততার রূপ ধারণ করলো এবং কথাবার্তা তিক্ততা এক পর্যায়ে মনেও ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।**

মহান আল্লাহ সূরা আনফাল নাযিল করার জন্যে এ মনস্তাত্বিক পরিবেশ বেছে নিয়েছেন। এ বিষয় দিয়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত নিজের পর্যালোচনামূলক বক্তব্যের সূচনা করেছেন। প্রথম বাক্যটির মধ্যেই প্রশ্নের জবাব নিহিত ছিল। বলছেনঃ তোমার কাছে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। মূল বক্তব্যে গনিমতের মালকে 'আনফাল' বলা হয়েছে। এ 'আনফাল' শব্দের মধ্যে মূল সমস্যার সামাধান নিহিত রয়ে গেছে। আনফাল বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে নাফল। আরবী ভাষায় ওয়াজিব অথবা যথার্থ অধিকার ও মূল পাওনার অতিরিক্তকে নফল বলা হয়। এ ধরনের নফল যদি কোন অধীনের পক্ষে থেকে হয় তাহলে তার অর্থ হয়, গোলাম নিজের প্রভুর জন্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের চাইতে বাড়তি কিছু কাজ করেছে। আর যখন তা মালিক বা কর্তার পক্ষ থেকে হয় তখন তার অর্থ হয় এমন ধরনের দান বা পুরস্কার যা প্রভুর পক্ষ থেকে বান্দা বা গোলামকে তার যথার্থ পাওনা ও অধিকারের অতিরিক্ত বা বখশিস হিসেবে দেয়া হয়েছে। কাজেই এখানে এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দেয়া পুরস্কার ও অনুগ্রহ সম্পর্কেই কি এ সমস্ত বাদানুবাদ, জিজ্ঞাসাবাদ ও কলহ -বিতর্ক চলেছে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তোমরা কবেই বা তার মালিক ও সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী হলে যে, তোমরা নিজেরাই তা বন্টন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে। যিনি এ সম্পদ দান করেছেন তিনি সিদ্ধান্ত দেবেন, কাকে দেয়া হবে, কাকে দেয়া হবে না এবং যাকে দেয়া হবে কতটুকু দেয়া হবে।

যুদ্ধ প্রসংগে এটা ছিল একটা অনেক বড় ধরনের নৈতিক সংস্কার। মুসলমানদের যুদ্ধ দুনিয়ার বস্তুগত স্বার্থ ও সম্পদ লাভ করার জন্য নয় বরং সত্যের নীতি অনুযায়ী দুনিয়ার নৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিকৃতির সংস্কার সাধন করার জন্যেই তা হয়ে থাকে। আর এ যুদ্ধ নীতি বাধ্য হয়ে তখনই অবলম্বন করা হয় যখন প্রতিবন্ধক শক্তিগুলো স্বাভাবিক দাওয়াত ও প্রচার পদ্ধিতির মাধ্যমে সংস্কার সাধনের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেয়। কাজেই সংস্কারদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতে হবে উদ্দেশ্যের প্রতি। উদ্দেশ্যের জন্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে আল্লাহর পক্ষে থেকে পুরস্কার হিসেবে যেসব সম্পদ লাভ করা হয় সেদিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়। শুরুতেই যদি এসব স্বার্থ থেকে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে না দেয়া হয় তাহলে অতি

দ্রুত তাদের মধ্যে নৈতিক অধপতন সূচিত হবে এবং তারা এসব স্বার্থ লাভকে নিজেদের উদ্দেশ্য হিসেবে গন্য করবে।

তাছাড়া এটা যুদ্ধ প্রসংগে একটা বড় রকমের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংস্কারও ছিল। প্রাচীন যুগের পদ্ধতি ছিল, যুদ্ধে যে মালমাত্তা যার হস্তগত হতো সেই তার মালিক গণ্য হতো।অথবা বাদশাহ ও সেনাপতি সমস্ত গনীমতের মালের মালিক হয়ে বসতো। প্রথম অবস্থায় দেখা যেতো প্রায়ই বিজয়ী সেনাদলের মধ্যে গনীমতের মাল নিয়ে প্রচন্ড সংঘাত দেখা দিয়েছে। এমনকি অনেক সময় তাদের এ অভ্যন্তরীণ সংঘাত তাদের বিজয়কে পরাজয়ে রুপান্তরিত করে দিতো। দ্বিতীয় অবস্থায় সৈন্যরা চুরি করতে অভ্যস্থ হয়ে পড়তো। তারা গনিমতের মাল লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করতো। কুরআন গনীমতের মালকে আল্লাহ ও রসূলের সম্পদ গণ্য করে প্রথমে এ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, সমস্ত গনিমতের মাল কোন রকম কমবেশী না করে পুরোপুরি ইমামের সামনে এনে রেখে দিতে হবে। তার মধ্য থেকে একটি সুইও লুকিয়ে রাখা যাবে না। তারপর সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে এ সম্পদ বন্টনের জন্যে নিম্নোক্ত আইন প্রণয়ন করেছেঃ **এ সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর কাজ ও তাঁর গরীব বান্দাদের সাহায্যের জন্য বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। আর বাকি চার ভাগ যুদ্ধে যে সেনাদল শরীক হয়েছিল তাদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দিতে হবে।** এভাবে জাহেলী যুগের পদ্ধতিতে যে দুটি ত্রুটি ছিল তা দূর হয়ে গেছে।

এখানে আরো একটি সুক্ষ্ম তত্ত্বও জেনে রাখতে হবে। গনিমতের মাল সম্পর্কে এখানে শুধুমাত্র এতটুকু কথাই বলাই শেষ করে দেয়া হয়েছে যে, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এ সম্পদ বন্টনের কোন প্রসংগ এখানে উত্থাপন করা হয়নি। এর কারণ প্রথমে স্বীকৃতি ও আনুগত্যের ভাবধারার পূর্ণতা লাভই ছিল উদ্দেশ্য। তারপর সামনের দিকে গিয়ে কয়েক রুকূ পরে এ সম্পদ কিভাকে বন্টন করতে হবে তা বলে দেয়া হয়েছে।তাই এখানে একে 'আনফাল' বলা হয়েছে এবং পঞ্চম রুকুতে এ সম্পদ বন্টন করার বিধান বর্ণনা প্রসংগে একে 'গানায়েম' (গনিমাতের বহুবচন।) বলা হয়েছে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৫৮

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ০৫

(এই গনীমাতের মালের ব্যাপারে ঠিক তেমনি অবস্থা দেখা দিচ্ছে যেমন অবস্থা সে সময় দেখা দিয়েছিল যখন) যেরূপ তোমার রাব্ব **তোমাকে তোমার গৃহ হতে (বদরের দিকে) বের করলেন, আর মুসলিমদের একটি দল তা পছন্দ করেনি।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ৫৯

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ০৭

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে দু’টি দলের মধ্য হতে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ওটা তোমাদের করতলগত হবে। **তোমরা এই আশা করেছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে,** আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে, তিনি স্বীয় নির্দেশাবলী দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করেন।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ বাণিজ্য কাফেলা বা কুরাইশ সেনাদল।

অর্থাৎ বাণিজ্য কাফেলা। তাদের সাথে মাত্র তিরিশ চল্লিশ জন রক্ষী ছিল।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৬০

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৯

স্মরণ কর সেই সংকট মুহুর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবূল করে বলেছিলেনঃ **নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক হাজার মালাইকা/ফেরেশতা দ্বারা (যুদ্ধে) সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ৬১

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ১০

আল্লাহ এটা করেছিলেন শুভ সংবাদ হিসাবে এবং যাতে তোমাদের চিত্ত আশ্বস্ত হয়। বস্তুতঃ সাহায্যতো শুধু আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৬২

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ১২

যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। **আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়** (প্রত্যেকটি আঙ্গুলের গিঁটে গিঁটে)।

তাফসীর বলে

কুরআন থেকে আমরা যে নীতিগত কথাগুলো জানতে পারি তার ভিত্তিতে আমরা মনে করি, **যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফেরেশতারা হয়তো প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করেননি এবং তরবারি হাতে নিয়ে সরাসরি মারামারি কাটাকাটিতে অংশও নেননি। সম্ভবত তারা এভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল যে, কাফেরদের ওপর মুসলমানরা যে আঘাত হানছিল তা ফেরেশতাদের সহযোগিতায় সঠিক জায়গায় পড়ছিল এবং প্রতিটি আঘাত হচ্ছিল, চূড়ান্ত ও মারাত্মক**। অবশ্যি সঠিক ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৬৩

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ১৫

হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন **যোদ্ধা-বাহিনীরূপে কাফিরদের সম্মুখীন হও, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না**।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৬৪

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ১৬

এমন দিনে **যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন বা নিজ দলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহর গজবে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল,** জাহান্নামই তার ঠিকানা আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

তাফসীর বলে

শত্রুর প্রবল চাপের মুখে নিজেদের পেছনের কেন্দ্রে ফিরে আসা অথবা নিজেদেরই সেনাদলের অন্য কোন অংশের সাথে যোগ দেবার জন্য সুপরিকল্পিত পশ্চাদপসরণ (Orderly Retreat) নাজায়েয নয়। **তবে যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিয়ে নয় রবং নিছক কাপুরুষতা ও পরাজিত মানসিকতার কারণে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ছত্রভংগ হয়ে পালানো (Rout) হারাম।** কারণ এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও লক্ষের তুলনায় মানুষের প্রাণটাই তার কাছে বেশী প্রিয় হয়ে উঠে। এ পালানোকে কবীরা গুনাহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনটি গুনাহ এমন যে, তার সাথে কোন নেকী সংযুক্ত হলে কোন লাভ নেই। এক, শিরক। দুই, বাপ-মায়ের অধিকার নষ্ট করা। তিন, **আল্লাহর পথে লড়াই এর ময়দান থেকে পালানো।** এভাবে তিনি আর একটি হাদীসে এমন সাতটি বড় বড় গুনাহের কথা বর্ণনা করেছেন যা মানুষের জন্যে ধ্বসংসকর এবং পরকালেও তাকে ভয়াবহ পরিণামের মুখোমুখি করবে। এর মধ্যে একটি গুনাহ হচ্ছে, কুফর ও ইসলামের যুদ্ধ কাফেরদের সামনে থেকে পালানো। এটা একটা কাপুরুষোচিত কাজ বলেই যে, একে এতবড় গুনাহ গণ্য করা হয়েছে তা নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, একজন সৈনিকের ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি এবং ছত্রভংগ হয়ে বেরিয়ে যাওয়া অনেক সময় পুরো একটি বাহিনীকে ভীত সন্ত্রস্ত ও দিশেহারা করে দেয় এবং পালাতে উদ্বুদ্ধ করে। আর একবার যখন একটি সেনাদলের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি ও পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, তখন তাদের বিপর্যয় ও ধ্বংস যে কতদূর গিয়ে ঠেকাবে তা বলা যায় না। এ ধরনের ছুটাছুটি ও পলায়নপরতা শুধু সেনাদলের জন্যেই ধ্বংসকর নয় বরং যে দেশের সেনাদল এ ধরনের পরাজয় বরণ করে তার জন্যেও বিপর্যয়কর।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৬৫

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ১৭

সুতরাং **তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন।** আর (হে নাবী!) যখন **তুমি (ধূলাবালি) নিক্ষেপ করেছিলে তখন তা মূলতঃ তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন।** এটা করা হয়েছিল মু'মিনদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন।

তাফসীর বলে

বদরের যুদ্ধে যখন মুসলমান ও কাফেরদের সেনাদল ময়দানে পরস্পরের মুখোমুখি হলো এবং আঘাত -পাল্টা আঘাতের সময় এসে গোলো **তখন নবী (সা) এক মুঠো বালি হাতে নিয়ে (শত্রুদলের চেহারাগুলো বিগড়ে যাক) বলে কাফেরদের দিকে ছুড়ে দিলেন। এই সংগে তার ইঙ্গিতে মুসলমারা অকস্মাত কাফেদের ওপর আক্রমণ করলো। এখানে এ ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ৬৬

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৩৯

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না ফিতনা (কুফর ও শিরক) খতম হয়ে যায় আর দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর তারা যদি বিরত হয় তাহলে তারা (ন্যায় বা অন্যায়) যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

তাফসীর বলে

ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারার ১৯৩ আয়াতের মুসলমানদের যুদ্ধের যে একটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল এখানে আবার সেই একই উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যের নেতিবাচক দিক হচ্ছে, ফিতনার অস্তিত্ব থাকবে না, আর এর **নৈতিক উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা মুমিনদের জন্যে শুধু বৈধই নয় বরং ফরযও।** এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য যুদ্ধ করা জায়েয নয় এবং মুমিনদের জন্যে তা শোভনীয়ও নয়।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৬৭

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৪০

আর যদি তোমাকে না'ই মানে (যুদ্ধ করার আদেশ) এবং দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহই তোমাদের (মুসলিমদের) অভিভাবক। তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী!

জিহাদ ও আক্রমণ: ৬৮

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৪১

তোমরা জেনে রেখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর রসূল, রসূলের আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য যদি তোমরা আল্লাহর উপর আর চূড়ান্ত ফায়সালার দিন অর্থাৎ দু'পক্ষের (মুসলমান ও কাফের বাহিনীর) মিলিত হওয়ার দিন আমি যা আমার বান্দাহর উপর অবতীর্ণ করেছিলাম তার উপর বিশ্বাস করে থাক। আর আল্লাহ হলেন সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

তাফসীর বলে

এ ভাষণটির শুরুতেই গনীমতের মাল সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তা আল্লাহর পক্ষে থেকে পুরস্কার এবং তার ব্যাপারে ফায়সালা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলই রাখেন। **এখানে এ গনীমতের মাল বন্টনের আইন কানুন বর্ণনা করা হয়েছে এখানে এ ফায়সালাটিও শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যুদ্ধের পরে সকল সৈনিকের সব ধরনের গনীমতের মাল এনে আমীর বা ইমামের কাছে জমা দিতে হবে। কোন একটি জিনিসও তারা লূকিয়ে রাখতে পারবে না।** তারপর এ সম্পদ থেকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ করে নিতে হবে । আয়াতে যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে এ দিয়ে তা পূর্ণ করতে হবে। বাকী চার অংশ যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে । কাজেই এ আয়াত অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামেশা যুদ্ধের পর ঘোষনা দিতেনঃ

"এ গনীমতের সম্পদগুলো তোমাদের জন্যই। এক পঞ্চমাংশ ছাড়া এর মধ্যে আমার নিজের কোন অধিকার নেই। আর এই এক পঞ্চামাংশ ও তোমাদেরই সামগ্রিক কল্যানার্থেই ব্যয়িত হয়। কাজেই একটি সুই ও একটি সূতা পর্যন্তও এনে রেখে দাও। কোন ছোট বা বড় জিনিস লুকিয়ে রেখো না। কারণ এমনি করা কলংকের ব্যাপার এবং এর পরিণাম জাহান্নাম"

এ বন্টনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অংশ একটিই। এ অংশটিকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা এবং সত্য দীন প্রতিষ্ঠিত কাজে ব্যয় করাই মূল লক্ষ।

আত্মীয় স্বজন বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তো তাঁর আত্মীয় স্বজনই বুঝোতো। কারণ তিনি নিজের সবটুকু সময় দীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করতেন। নিজের অন্ন সংস্থানের জন্যে কোন কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। একারনে তাঁর নিজের তাঁর পরিবারের লোকদের এবং যেসব আত্মীয়ের ভরণ পোষনের দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল তাদের সবার প্রয়োজন পূরণ করার কোন একটা ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন ছিল। তাই খুমুস তথা এক পঞ্চামাংশের তাঁর আত্মীয়ের অংশ রাখা হয়েছে কিন্তু নবী (সা) এর ইন্তেকালের পর আত্মীয় স্বজনদের এ অংশটি কাদেরকে দেয়া হবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক দলের মতে নবী (সা) পর এ অংশ বাতিল হয়ে গেছে । দ্বিতীয় দলের মতে, নবী (সা) এর পরে যে ব্যক্তি তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হবেন তার আত্মীয় স্বজনরা এ অংশটি পাবে। তৃতীয় দলটির মতে, এ অংশটি নবীর বংশের ফকীর -মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করা হতে থাকবে। আমার নিজস্ব গবেষনা -অনুসন্ধানের ফলে যেটুকু আমি জানতে পেরেছি, তাতে দেখা যায় যে, খোলাফায়ের রাশেদীনের যামানায় এ তৃতীয় মতটিই কার্যকর হতে থেকেছে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৬৯

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৪২

স্মরণ কর, যখন তোমরা উপত্যকার নিকট প্রান্তে ছিলে আর তারা ছিল দূরের প্রান্তে আর উটের আরোহী কাফেলা (আবূ সুফইয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশের সম্পদ সহ কাফেলা) ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে। যদি তোমরা যুদ্ধ করার ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে, **তবুও যুদ্ধ করার এ সিদ্ধান্ত তোমরা অবশ্যই রক্ষা করতে পারতে না (তোমাদের দুর্বল অবস্থার কারণে), যাতে আল্লাহ সে কাজ সম্পন্ন করতে পারেন যা ছিল পূর্বেই স্থিরীকৃত, যেন যাকে ধ্বংস হতে হবে সে যেন সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে ধ্বংস হয় আর যাকে জীবিত থাকতে হবে সেও যেন সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে জীবিত থাকে।** আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ প্রমাণ হয়ে যাবে যে, যে জীবিত আছে তার জীবিত থাকাই উচিত ছিল এবং যে ধ্বংস হয়ে গেছে তার ধ্বংস হয়ে যাওয়াই সমীচীন ছিল। এখানে জীবিত থাকা ধ্বংস হওয়া বলতে ব্যক্তিদেরকে নয় বরং ইসলাম ও জাহেলিয়াতকে বুঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ আল্লাহ অন্ধ, বধির ও বেখবর নন । বরং তিনি জ্ঞানী -সবকিছু জানেন এবং সবকিছু দেখেন । তাঁর রাজত্বে অন্ধের মত আন্দাজে কাজ কারবার হচ্ছে না।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৭০

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৪৩

আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নযোগে ওদের সংখ্যা অল্প দেখিয়েছিলেন, যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হত, কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর বলে

এটা এমন এক সময়ের কথা যখন নবী (সা) মুসলমানদের নিয়ে মদীনা থেকে বের হচ্ছিলেন পথে কোন মনযিলে অবস্থান করেছিলেন তখন কাফেদের যথার্থ সৈন্য সংখ্যা জানা যায়নি। এ সময় নবী (সা) স্বপ্নে কাফেরদের সেনাবাহিনী দেখলেন। তাঁর সামনে যে দৃশ্যপট পেশ করা হয় তাতে শত্রু সেনাদের

খুব বেশী নয় বলে তিনি অনুমান করতে পারলেন। এ স্বপ্নের বিচরণ তিনি মুসলমানদের শুনালেন। এতে মুসলমানদের হিম্মত বেড়ে গেলো। এবং তারা তাদের অগ্রযাত্র অব্যহত রাখলো।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৭১

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৪৪

আরও স্মরণ কর, যা ঘটানোর ছিল, **চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করার জন্য যখন দু'দল মুখোমুখী দন্ডায়মান হয়েছিল তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের সংখ্যা খুব অল্প দেখাচ্ছিল, আর ওদের চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট হচ্ছিল,** সমস্ত বিষয় ও সমস্যাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৭২

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৪৫

হে ঈমানদারগণ! **যখন তোমরা কোন বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন অবিচল থাকবে** আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৭৩

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৪৬

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করো না, তা করলে **তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে।** আর ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ নিজেদের আবেগ অনুভূতি ও কামনা-বাসনাকে সংযত রাখো । তাড়াহুড়ো করো না। ভীত-আতংকিত হওয়া, লোভ-লালসা পোষণ করা এবং অসংগত উৎসাহ -উদ্দীপনা প্রকাশ থেকে দূরে থাকো। স্থির মস্তিস্কে এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও যথার্থ পরিমিত বিচক্ষণতা ও ফায়সালা করার শক্তি সহকারে কাজ করে যাও। বিপদ-আপোদ ও সংকট -সমস্যার সম্মুখীন হলেও যেন তোমাদের পা না টলে উত্তেজনাকর

পরিস্থিতি দেখা দিলে ক্রোধ ও ক্ষোভের তরংগে ভেসে গিয়ে তোমরা যেন কোন অর্থহীন কাজ করে না বসো। বিপদের আক্রমণ চলতে থাকলে এবং অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে দেখতে পেলে মানসিক অস্থিরতার কারণে তোমাদের চেতনা শক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল না হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য সফল হবার আনন্দে অধীন হয়ে অথবা কোন আধা-পরিপক্ক ব্যবস্থাপনাকে আপাতদৃষ্টিতে কার্যকর হতে দেখে তোমাদের সংকল্প যেন তাড়াহুড়োর শিকার না হয়ে পড়ে। আর যদি কখনো বৈষয়িক স্বার্থ, লাভ ও ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্ররোচনা তোমাদের লোভাতুর করে তোলে তাহলে তাদের মোকাবিলায় তোমাদের নফস যেন দূর্বল হয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সেদিকে এগিয়ে যেতে না থাকে। এ সমস্ত অর্থ শুধু একটি মাত্র শব্দ সবর এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন এসব দিয়ে যারা সবরকারী হবে তারাই আমার সাহায্য ও সমর্থন পেয়ে ধন্য হবে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৭৪

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৪৭

তোমরা তাদের মতো আচরণ করনা যারা নিজেদের গৃহ হতে সদর্পে এবং **লোকদেরকে (নিজেদের শক্তি) প্রদর্শন করে বের হয় ও মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখে,** তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

তাফসীর বলে

এখানে কুরাইশ গোত্রভুক্ত কাফেরদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের সেনাবাহিনী মক্কা থেকে বের হয়েছিল অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে। বাদ্য-গীত পারদর্শীনী ক্রীতদাসী পরিবেষ্টিত হয়ে তারা চলছিল। পথের মাঝাখানে বিভিন্ন জায়াগায় থেমে তারা নাচ-গান, শরাব ও আনন্দ উল্লাসের মাহফিল জমিয়ে তুলেছিল। পথে যেসব গোত্র ও জনবসতির ওপর দিয়ে তারা যাচ্ছিল তাদের ওপর নিজেদের শান শওকত, সংখ্যাধিক্য ও শক্তির দাপট এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের ভীতি ও প্রভাব বিস্তার করে চলছিল। তারা এমনভাবে বাহাদুরী দেখাচ্ছিল যেন তাদের সামনে দাঁড়াবার মত কেউ নেই। এমনি একটা উৎকট অহংকারের ভাব তাদের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছিল। এ ছিল তাদের নৈতিক অবস্থা। আর যে উদ্দেশ্যে তারা ঘর থেকে বের হয়েছিল তা ছিল তাদের এ নৈতিক অবস্থার চাইতেও আরো বেশী নোংরা ও অপবিত্র এবং তা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল অতিরিক্ত অভিশাপের বোঝা। তারা সত্য, সততা ও ইনসাফের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার জন্য ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসেনি। বরং এ ঝাণ্ডা বুলন্দ না হয় এবং যে একটি মাত্র দল সত্যের এ লক্ষে পৌছার জন্যে এগিয়ে এসেছে তাকেও যাতে খতম করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই তারা বের হয়েছিল। তারা চাইছিল দুনিয়ায় এ ঝাণ্ডা বহনকারী আর কেউ থাকবে না। এ

ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা এমনটি হয়ে যেয়ো না। আল্লাহ তোমাদের ঈমান ও সত্য প্রিয়তার যে নিয়ামত দান করেছন তার দাবী অনুযায়ী তোমাদের চরিত্র যেমন পাক-পবিত্র হতে হবে তেমনি তোমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যও এ নির্দেশ শুধুমাত্র সেই যুগের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল না। আজকের জন্যও এবং চিরকালের জন্যে এ নির্দেশ প্রযোজ্য। সেদিন কাফেরদের সেনাবাহিনীর যে অবস্থা ছিল আজো তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। বেশ্যালয়, ব্যভিচারের আড্ডা ও মদের পিপা যেন অবিচ্ছেদ্য অংগের মত তাদের সাথে জড়িয়ে আছে। গোপনে নয়, প্রকাশ্যে তারা অত্যন্ত নির্লজ্জতার সাথে মেয়েও মদের বেশী বেশী বরাদ্দ দাবী করে । তাদের সৈন্যরা নিজেদের জাতির কাছে যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সমাজের বেশী সংখ্যক যুবতী মেয়েদেরকে তাদের হাতে তুলে দেবার দাবী জানাতে লজ্জাবোধ করে না। এ অবস্থায় অন্য জাতিরা এদের থেকে কি আশা করতে পারে যে, এরা নিজেদের নৈতিক আবর্জনার ফাঁকে তাদেরকে ডুবিয়ে দেবার ব্যাপারে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করবে না। আর এদের দম্ভ ও অহংকারের ব্যাপারে বলা যায়, এদের প্রত্যেকটি সৈনিক ও অফিসারের চালচলন ও কাথাবার্তার ধরন থেকে তা একেবারে পরিস্কার দেখা যেতে পারে। আর এদের প্রত্যেক জাতির নেতৃস্থানীয় পরিচালকবৃন্দের বক্তৃতাবলীতে--------- (আজ তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারে দুনিয়াতে এমন কেউ নেই) এবং ------------(কে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী।) ধরনের দম্ভোক্তিই শ্রুত হয়ে থাকে। এদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ এ নৈতিক পূতিগন্ধময় আবর্জনা থেকেও বেশী কুৎসিত ও নোংরা। এদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত প্রতারণাপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে দুনিয়াবাসীকে একথার নিশ্চয়তা দিয়ে যায় যে, মানবতার কল্যাণ ছাড়া তার সামনে আর কোন লক্ষ নেই। কিন্তু আসলে শুধুমাত্র মানবতার কল্যাণটাই তাদের লক্ষ্যের অন্তরভুক্ত নয়, বাকী সবকিছুই সেখানে আছে।এদের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তার এ পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির জন্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার জাতি একাই হবে তার ওপর দখলদার এবং অন্যদের তার চাকর ও কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকতে হবে। কাজেই এখানে ঈমানদারদেরকে কুরআন এ স্থায়ী নির্দেশ দিয়েছে যে, এ ফাসেক ও ফাজেরদের আচার আচরণ থেকেও দূরে থাকো। আবার যেসব অপবিত্র ও পূতিগন্ধময় উদ্দেশ্য নিয়ে এরা যুদ্ধে লিপ্ত হয় সেই ধরনের উদ্দশ্যে নিজেদের ধন-প্রাণ উৎসর্গ করতে উদ্যোগী হয়ো না।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৭৫

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৪৮

স্মরণ কর, যখন শয়ত্বান তাদের কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে খুবই চাকচিক্যময় করে দেখিয়েছিল আর তাদেরকে বলেছিল, 'আজ তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারে

মানুষের মাঝে এমন কেউই নাই, আমি তোমাদের পাশেই আছি।' অতঃপর দল দু'টি যখন পরস্পরের দৃষ্টির গোচরে আসলো তখন সে পিছনে সরে পড়ল আর বলল, 'তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই, **আমি তো দেখি (কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহর নাযিলকৃত ফেরেশতা) যা তোমরা দেখতে পাও না, আমি অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করি কেননা আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।'**

জিহাদ ও আক্রমণ: ৭৬

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৫৭

যুদ্ধে তোমরা যদি তাদেরকে বাগে পেয়ে যাও তাহলে ওদের পেছনে যারা ওদের সাথী-সঙ্গী আছে তাদের থেকে ওদেরকে এমনভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে যাতে মনে রাখার মত তারা একটা শিক্ষা পেয়ে যায়।

তাফসীর বলে

এর অর্থ হচ্ছে, যদি কোন জাতির সাথে আমাদের চুক্তি হয়, তারপর তারা নিজেদের চুক্তির দায়িত্ব বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে আমরাও চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। এ ক্ষেত্রে আমরাও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ন্যায়সংগত অধিকার লাভ করবো। তাছাড়া যদি কোন জাতির সাথে আমাদের যুদ্ধ চলতে থাকে এবং আমরা দেখি, শত্রুপক্ষের সাথে এমন এক সম্প্রদায়ের লোকরাও যুদ্ধে শামিল হয়েছে যাদের সাথে আমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে আমরা তাদেরকে হত্যা করতে এবং তাদের সাথে শত্রুর মত ব্যবহার করতে একটুও দ্বিধা করবো না। কারণ তারা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের সম্প্রদায়ের চুক্তি ভংগ করে তাদের ধন-প্রাণের নিরাপত্তার প্রশ্নে তাদের সম্প্রদায়ের সাথে আমাদের যে চুক্তি রয়েছে তা লংঘন করেছে। ফলে নিজেদের নিরাপত্তার অধিকার তারা প্রমাণ করতে পারেনি।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৭৭

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৫৮

আর যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা কর তাহলে (তাদের চুক্তিকে) **তাদের প্রতি নিক্ষেপ কর যাতে সমান সমান অবস্থা বিরাজিত হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই (ওয়াদা-চুক্তি-প্রতিশ্রুতি) ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।**

তাফসীর বলে

এ আয়াতের দৃষ্টিতে যদি কোন ব্যক্তি, দল বা দেশের সাথে আমাদের চুক্তি থাকে এবং তার কর্মনীতি আমাদের মনে তার বিরুদ্ধে চুক্তি মেনে চলার ব্যাপারে গড়িমসি করার অভিযোগ সৃষ্টি করে অথবা সুযোগ পেলেই সে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ ধরনের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে আমাদের পক্ষে একতরফাভাবে এমন সিদ্ধান্ত হঠাৎ কোনক্রমেই বৈধ নয় যে, আমাদের ও তার মধ্যে কোন চুক্তি নেই। আর এই সংগে হঠাৎ তার সাথে আমাদের এমন ব্যবহার করা উচিত নয় যা একমাত্র চুক্তি না থাকা অবস্থায় করা যেতে পারে। বরং এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে কোন বিরোধীতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার আগে দ্বিতীয় পক্ষকে স্পষ্টভাবে একথা জানিয়ে দেবার জন্যে আমাদের তাগিদ দেয়া হয়েছে যে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এখন আর কোন চুক্তি নেই। এভাবে চুক্তি ভংগ করার জ্ঞান আমরা যতটুকু অর্জন করেছি তারাও ততটুকু অর্জন করতে পারবে এবং চুন্তি কখনো অপরিবর্তিত আছে এ ধরনের ভূল ধারণা তারা পোষণ করবে না। আল্লাহর এ ফরমান অনুযায়ী নবী (সা) ইসলামের আন্তির্জাতিক রাজনীতির নিম্নোক্ত স্থায়ী মূলনীতি ঘোষনা করছিলেনঃ

"কোন জাতির সাথে কারোর কোন চুক্তি থাকলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার আগে তার চুক্তি লংঘন করা উচিত নয়। এক পক্ষ চুক্তি ভংগ করলে উভয় পক্ষের সমতার ভিত্তিতে অপর পক্ষ চুক্তি বাতিল করার কথা জানাতে পারে"।

তারপর এ নিয়মকে তিনি আরো একটু ব্যাপকভিত্তিক করে সমস্ত ব্যাপারে এ সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেনঃ --------(যে ব্যক্তি তোমরা সাথে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে খেয়ানত করো না)এ নীতিটি শুধুমাত্র বক্তৃতা বিবৃতিতে বলার ও বইয়ের শোভা বর্ধনের জন্যে ছিল না বরং বাস্তব জীবনে একে পুরোপুরি মেনে চলা হতো। আমীর মুআবীয়া (রা) একবার নিজের রাজত্বকালে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে সেনা সমাবেশ করতে শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথেই অতর্কিতে রোমান এলাকায় আক্রমণ চালাবেন। তাঁর এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রসূলের (সা)সাহাবী আমর ইবনে আমবাসা (রা) কঠোর প্রতিবাদ জানান। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসটি শুনিয়েই চুক্তির মেয়াদের মধ্যেই এ ধরনের শত্রুতামূলক কার্যকলাপকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অবিহিত করেন। অবশেষে আমীর মু'আবীয়াকে এ নীতির সামনে মাথা নোয়াতে হয় এবং তিনি সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ বন্ধ করে দেন।

একতরফাভাবে চুক্তি ভংগ ও যুদ্ধ ঘোষনা করা ছাড়া আক্রমণ করার পদ্ধতি প্রাচীন জাহেলী যুগেও ছিল এবং বর্তমান যুগের সুসভ্য জাহিলিয়াতেও এর প্রচলন আছে। এর নতুনতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার ওপর জার্মানীর আক্রমণ। এবং ইরানের বিরুদ্ধে রাশিয়া ও বৃটেনের সামরিক কার্যক্রম। সাধারণত এ ধরনের কার্যক্রমের স্বপক্ষে এ ওযর পেশ করা হয় যে, আক্রমণের পূর্বে জানিয়ে দিলে প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে যায়।এ অবস্থায় কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় অথবা যদি আমরা অগ্রসর হয়ে হস্তক্ষেপ না করতাম তাহলে আমাদের শত্রুরা সুবিধা লাভ করতো। কিন্তু নৈতিক দায়িত্ব পালন থেকে অব্যহতি লাভের জন্যে এ ধরনের বাহানাকে যদি যথেষ্ট মনে করা হয় তাহলে দুনিয়ায় আর এমন কোন অপরাধ থাকে না যা কোন না কোন বাহানায় করা যেতে পারে না।প্রত্যেক চোর,ডাকাত, ব্যভিচারী, ঘাতক, ও জালিয়াত নিজের অপরাধের জন্যে এমনি ধরনের কোন না কোন কারণ দর্শাতে পারে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, আন্তরজাতিক পরিবেশে এরা একটি জাতির জন্যে এমন অনেক কাজ বৈধ মনে করে যা জাতীয় পরিবেশে কোন ব্যক্তি বিশেষ করলে তাদের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে গণ্য হয়।

এ প্রসংগে একথা জেনে নেয়ারও প্রয়োজন যে, ইসলামী আইন শুধুমাত্র একটি অবস্থায় পূর্ব ঘোষণা আক্রমণ করা বৈধ গণ্য করে। সে অবস্থাটি হচ্ছে, দ্বিতীয় পক্ষ যখন ঘোষণা দিয়েই চুক্তি ভংগ করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতামূলক কাজ করে। এহেন অবস্থায় উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের পক্ষ থেকে তার কাছে চুক্তি ভংগ করার নোটিশ দেবার প্রয়োজন হয় না। বরং আমরা অঘোষিতভাবে তার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার লাভ করি।বনী খুযাআর ব্যাপারে কুরাইশরা যখন হুদাইবিয়ার চুক্তি প্রকাশ্যে ভংগ করে তখন নবী (সা) তাদেরকে চুক্তি ভংগ করার নোটিশ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি এবং কোন প্রকার ঘোষনা না দিয়েই মক্কা আক্রমণ করে বসেন। নবী (সা) এর এ কার্যক্রম থেকেই মুসলিম ফকীহগণ এ ব্যতিক্রমধর্মী বিধি রচনা করেছেন। কিন্তু কোন অবস্থায় যদি আমরা এ ব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম থেকে ফায়দা উঠাতে চাই তাহলে অবশ্যি সেই সমস্ত অবস্থা আমাদের সামনে থাকতে হবে যে অবস্থায় নবী (সা) এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এভাবে তাঁর সমগ্র কার্যক্রমের একটি সুবিধাজনক অংশ মাত্রের অনুসরণ না করে তার সবটুকুর অনুসরণ করা হবে।হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলো থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

একঃ কুরাইশদের চুক্তি ভংগের ব্যাপারটি এত বেশী সুস্পষ্ট ছিল যে, তারা যে চুক্তি ভংগ করেছে এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোন সুযোগ ছিল না। কুরাইশরা এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা নিজেরাও চুক্তি যথার্থই ভেঙে গেছে বলে স্বীকার করতো। তারা নিজেরাই চুক্তি নবায়নের জন্যে আবু সুফিয়ানকে মদীনায় পাঠিয়েছিল। এর পরিস্কার অর্থ ছিল, তাদের দৃষ্টিতেও চুক্তি অক্ষুন্ন ছিল না। তবুও চুক্তি ভংগকারী জাতি নিজেই চুক্তি ভঙ্গ করার কথা স্বীকার করবে, এটা জরুরী না। তবে চুক্তি ভংগ করার ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত হওয়া অবশ্যি জরুরী।

দুইঃ কুরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভংগ করার পরও নবী (সা) নিজের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বা ইশারা ইঙ্গিতে এমন কোন কথা বলেননি যা থেকে এ ইশারা পাওয়া যায় যে, এ চুক্তি ভংগ করা সত্ত্বেও তিনি এখানো তাদেরকে একটি চুক্তিবদ্ধ জাতি মনে করেন এবং এখনো তাদের সাথে তাঁর চুক্তিমূলক সম্পর্ক বজায় রয়েছে বলে মনে করেন। সমস্ত বর্ণনা একযোগে একথা প্রমাণ করে যে, আবু সুফিয়ান যখন মদীনায় এসে চুক্তি নবায়নের আবেদন করে তখন তিনি তা গ্রহণ করেননি।

তিনঃ তিনি নিজে কুরাইশদের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ্যে গ্রহণ করেন। তাঁর কার্যক্রমে কোন প্রকার প্রতারণার সামান্যমত গন্ধও পাওয়া যায় না। তিনি বাহ্যত সন্ধি এবং গোপনে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেননি।

এটিই এ ব্যাপারে নবী (সা) এর উত্তম আদর্শ। কাজেই ওপরে উল্লেখিত আয়াতের সাধারণ বিধান থেকে সরে গিয়ে যদি কোন কার্যক্রম অবলম্বন করা যেতে পারে তাহলে তা এমনি বিশেষ অবস্থায়ই করা যেতে পারে এবং নবী (সা) যে ধরনের সরল-সহজ-ভদ্রজনোচিত পথে তা করেছিলেন তেমনি পথেই করা যেতে পারে।

তাছাড়া কোন চুক্তিবদ্ধ জাতির সাথে কোন বিষয়ে যদি আমাদের কোন বিবাদ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আমরা দেখি পারস্পরিক আলাপ আলোচনা বা আন্তর্জাতিক সালিশের মাধ্যমে এ বিবাদের মীমাংসা হচ্ছে না অথবা যদি আমরা দেখি, দ্বিতীয় পক্ষ বল প্রয়োগ করে এর মীমাংসা করতে উঠে পড়ে লেগেছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য বল প্রয়োগ করে এর মীমাংসায় পৌছানো সম্পূর্ণরূপে বৈধ হয়ে যাবে। কিন্তু উপরোক্ত আয়াত আমাদের ওপর এ নৈতিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের এ বল প্রয়োগ পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর হতে হবে এবং তা হতে হবে প্রকাশ্যে। লুকিয়ে লুকিয়ে গোপনে এমন ধরনের সামারিক কার্যক্রম করা যার প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে আমরা প্রস্তুত নই, একটি অসদাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলাম এর শিক্ষা আমাদের দেয়নি।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৭৮

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৫৯

যারা কাফির তারা (বদর প্রান্তরে প্রাণ বাঁচাতে পেরে) যেন মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তারা মু'মিনগণকে হতবল করতে পারবেনা।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৭৯

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৬০

তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে যদ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জাননা, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর, তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি (কম দিয়ে) অত্যাচার করা হবেনা।

তাফসীর বলে

এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে যুদ্ধোপকরণ ও একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী (Standing Army) সর্বক্ষণ তৈরী থাকতে হবে। তাহলে প্রয়োজনের সময় সংগে সংগেই সামারিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভবপর হবে। এমন যেন না হয়, বিপদ মাথার ওপর এসে পড়ার পর হতবুদ্ধি হয়ে তাড়াতাড়ি স্বেচ্ছাসেবক, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রসদপত্র যোগাড় করার চেষ্টা করা হবে এবং এভাবে প্রস্তুতি পূর্ব সম্পন্ন হতে হতেই শত্রু তার কাজ শেষ করে ফেলবে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৮০

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৬৫

হে নাবী! যুদ্ধের ব্যাপারে মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে **বিশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে (ঐরূপ) একশ' জন থাকলে তারা একহাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে।** কেননা তারা হচ্ছে এমন লোক যারা (ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে) কোন বোধ রাখে না।

তাফসীর বলে

আধুনিক পরিভাষায় যাকে আভ্যন্তরীণ সুক্ষ্মতর, শক্তি, নৈতিক শক্তি বা মনোবল (Morale) বলা হয় আল্লাহ তাকেই ফিকাহ, বোধ, উপলব্ধি, বুদ্ধি, ও ধী-শক্তি (Understanding)বলেছেন। এ অর্থ ও ভাবধারা প্রকাশের জন্যে এ শব্দটি আধুনিক পরিভাষার তুলনায় বেশী বিজ্ঞানসম্মত। যে ব্যক্তি নিজের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সঠিকভাবে সচেতন এবং ঠাণ্ডা মাথায় ভালভাবে চিন্তে এ জন্যে সংগ্রাম করতে থাকে যে, যে জিনিসের জন্যে সে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে এসেছে তা তার ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান এবং তা নষ্ট হয়ে গেলে তার জন্যে বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়বে, সে এ ধরনের চেতনা ও উপলব্দি থেকে বঞ্চিত একজন যোদ্ধার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী শক্তিশালী। যদিও শরীরিক শক্তির প্রশ্নেউভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই তারপর যে ব্যক্তি সত্যের জ্ঞান রাখে, যে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব,

আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর সা. নিজের সম্পর্ক এবং পার্থিব জীবনের তাৎপর্য, মৃত্যুর তাৎপর্য ও মৃত্যুর পরের জীবনের তাৎপর্য ভালভাবে উপলব্দি করে এবং যে ব্যক্তি হক ও বাতিলের পার্থক্য আর এই সাথে বাতিলের বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কেও সঠিকভাবে জ্ঞাত, তার শক্তির ধারে কাছেও এমন সব লোক পৌছতে পারবে না যারা জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতাবাদ বা শ্রেনী সংগ্রামের চেতনা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে নেমে আসে। এ জন্যেই বলা হয়েছে, একজন বোধশক্তি সম্পন্ন সজাগ মুমিন ও একজন কাফেরের মধ্যে সত্যের জ্ঞান ও সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই প্রকৃতগতভাবে এক ও দশের অনুপাত সৃষ্টি হয়। কিন্তু শুধুমাত্র উপলব্দি ও জ্ঞানের সাহায্যে এই অনুপাত প্রতিষ্ঠিত হয় না বরং সেই সাথে সবরের গুণও এর একটি অপরিহার্য শর্ত।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৮১

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৬৬

(তবে) এখন আল্লাহ তোমাদের দায়িত্বভার কমিয়ে দিয়েছেন। **আল্লাহ তো জানেন যে তোমাদের ভিতর দুর্বলতা রয়ে গেছে, কাজেই তোমাদের মাঝে যদি একশ' জন ধৈর্যশীল হয় তবে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মাঝে এক হাজার (ঐ রকম) লোক পাওয়া যায় তাহলে তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজার লোকের উপর জয়ী হবে।** আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে (আছেন)।

তাফসীর বলে

এর অর্থ এ নয় যে, প্রথমে এক ও দশের অনুপাত ছিল এবং এখন যেহেতু তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা এসে গেছে তাই এক ও দুইয়ের অনুপাত কায়েম করা হয়েছে। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, নীতিগত ও মানগতভাবে মুমিন ও কাফেরের মধ্যেতো এক ও দশেরই অনুপাত বিদ্যমান কিন্তু যেহেতু এখন তোমাদের নৈতিক প্রশিক্ষণ পূর্ণতা লাভ করেনি এবং এখানো তোমাদের চেতনা, উপলব্ধি ও অনুধাবন ক্ষমতা পরিপক্কতা অর্জন করেনি,তাই আপাতত সর্বনিম্ন মান ধরেই তোমাদের কাছে দাবী করা হচ্ছে যে, নিজেদের চাইতে দ্বিগুণ শক্তিধরদের বিরুদ্ধে লড়তে তো তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, ২য় হিজরীতে এ বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। তখন মুসলমানদের মধ্যে বহু লোক সবেমাত্র নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের প্রশিক্ষণ ছিল প্রাথমিক অবস্থায়।পরে নবী (সা) এর নেতৃত্বে যখন তারা পরিপক্কতা অর্জন করলেন তখন প্রকৃতপক্ষে তাদের ও কাফেরদের মধ্যে, এক ও দশের অনুপাতই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বস্তুত নবী (সা) এর আমলের শেষের দিকে এবং খোফায়ে রাশেদীনের যুগের বিভিন্ন যুদ্ধে বারবার এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৮২

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৬৭

কোন নাবীর জন্য এটা সঠিক কাজ নয় যে, **দেশে (আল্লাহর দুশমনদেরকে) পুরোমাত্রায় পরাভূত না করা পর্যন্ত তার (হাতে) যুদ্ধ-বন্দী থাকবে।** তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও আর আল্লাহ চান আখিরাত (এর সাফল্য), আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৮৩

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৬৮

আল্লাহর লেখন যদি পূর্বেই লেখা না হত তাহলে তোমরা যা (মুক্তিপণ হিসেবে) গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি পতিত হত।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৮৪

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৬৯

এক্ষণে, **যুদ্ধে গানীমাত হিসেবে যা তোমরা লাভ করেছ তা ভোগ কর, তা বৈধ ও পবিত্র।** আল্লাহকে ভয় করে চলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

তাফসীর বলে

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ যেসব হাদিস বর্ণনা করেছেন তার মোদ্দকথা হচ্ছেঃ **বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের যেসব লোক বন্দী হয় তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে এ নিয়ে পরে পরামর্শ হয়। হযরত আবু বরক (রা) পরামর্শ দেন, ফিদিয়া (মুক্তিপণ) নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া হোক। হযরত উমর(রা) বলেন, তাদের হত্যা করা হোক। নবী (সা) হযরত আবু বরকরের (রা) মত গ্রহণ করেন এবং ফিদিয়া তথা বিনিময় মূল্য স্থিরিকৃত হয়ে যায়। এর ফলে মহান আল্লাহ তিরস্কার করে ও অসন্তোষ প্রকাশ করে এ আয়াত নাযিল করেন। কিন্তু তাফসীরকারগণ "আল্লাহর লিখন যদি আগেই লেখা না হয়ে যেতো আয়াতের" এ অংশের কোন যুক্তি সংগত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।** তারা বলেন, এখানে আল্লাহর তাকদীরের কথা বলা হয়েছে অথবা আল্লাহ আগেভাগেই মুসলমানদের জন্যে গনীমতের মাল হালাল করে দেবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যতক্ষন পর্যন্ত শরীয়াতের বিধান প্রদানকারী অহীর মাধ্যমে কোন জিনিসের অনুমতি না দেয়া হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে

না। কাজেই নবী (সা) সহ সমগ্র ইসলাম জামায়াত এ ব্যাখ্যার কারণে গুনাহাগার গণ্য হবে। খবরে ওয়াহিদ (অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হাদীস) এর ওপর নির্ভর করে এ ধরনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নেয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার।

আমার মতে এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ বদরের যুদ্ধের আগে সূরা মুহাম্মাদে যুদ্ধ সম্পর্কে যে প্রাথমিক নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিলঃ

"কাজেই যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকো তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো।শেষে যখন তোমরা তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করবে তখন তাদের কষে বাঁধবে। তারপর হয় করুণা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না যুদ্ধের অবসান ঘটে" । সূরা মুহাম্মাদঃ ৪

এ বক্তব্যে যুদ্ধাবন্দীদের থেকে ফিদিয়া আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এই সংগে এ মর্মে শর্ত লাগানো হয়েছিল যে, প্রথমে শত্রুদের শক্তি ভালভাবে চূর্ণ করে দিতে হবে তারপর বন্দী করার কথা চিন্তা করতে হবে। এ ফরমান অনুযায়ী মুসলমানরা বদরে যেসব যুদ্ধ অপরাধীকে বন্দী করেছিল, তারপর তাদের কাছ থেকে যেসব ফিদিয়া আদায় করেছিল তা অনুমতি মোতাবিক ছিল ঠিকই কিন্তু সেখানে ভুলটি ছিল এইঃ পূর্বাহ্নে "শত্রুর শক্তি ভালভাবে চূর্ণ করে দেবার" যে শর্তটি রাখা হয়েছিল তা পূর্ণ করার ব্যাপারে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল্ যুদ্ধে কুরাইশ সেনারা যখন পালাতে শুরু করলো তখন মুসলমানদের অনেকেই গনীমতের মাল লুটপাট করতে এবং কাফেরদের ধরে ধরে বাধঁতে লাগলো। এ সময় খুব কম লোকই শত্রুদের পিছনে কিছু দূর পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। অথচ মুসলমানরা যদি পূর্ণ শক্তিতে তাদেরকে ধাওয়া করতো তাহলে সেদিনই কুরাইশদের শক্তি নির্মুল হয়ে যেতো।এ জন্যে আল্লাহ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আর এ ক্ষোভ নবীর ওপর নয় বরং মুসলমানদের ওপর আল্লাহার এ মহান ফরমানের মর্ম হচ্ছেঃ তোমরা এখনো নবীর মিশন ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারোনি। ফিদিয়া ও গনিমাতের মাল আদায় করে অর্থভাণ্ডার ভরে তোলা নবীর আসল কাজ নয়। একমাত্র কুফরের শক্তির দম্ভ ভেঙে গুড়িয়ে দেয়ার কাজটিই তার উদ্দেশ্যও লক্ষের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখে।কিন্তু দুনিয়ার লোভ লালসা তোমাদের ওপর বারবার প্রাধান্য বিস্তার করে। প্রথমে তোমরা চাইলে শত্রুর মূল শক্তিকে এড়িয়ে বাণিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমণ চালাতে। তারপর চাইলে শত্রুর মাথা গুড়িয়ে দেবার গনীমতের মাল লুট করতে ও যুদ্ধ অপরাধীদের বন্দী করতে। আবার এখন গনিমাতের মাল নিয়ে ঝগড়া করতে শুরু করেছো।যদি আমি আগেই ফিদিয়া আদায় করার অনুমতি না দিয়ে দিতাম তাহলে তোমাদের এ কার্যক্রমের জন্যে তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। যা হোক এখন তোমরা যা কিছু নিয়েছো তা খেয়ে ফেলো কিন্তু আগামীতে এমন ধরনের আচরণ অবলম্বন করা থেকে দূরে থাকো।যা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। এ ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমি মত স্থির করে ফেলেছিলাম এমন সময় ইমাম আবু বরক জাসসাস তার আহকামূল কুরাআন গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাটিকে কমপক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন দেখে আমি আরো একটু বেশী মানসিক নিশ্চিন্ততা অনুভব করতে পেরেছি। তারপর সীরাতে ইবনে হিশামও একটি

রেওয়াতে দেখেছি। তাতে বলা হয়েছে, মুসলিম মুজাহিদরা যখন গনীমাতের মাল আহরণ করতে ও কাফেরদের কে ধরে ধরে বেঁধে ফেলতে ব্যস্ত ছিলেন তখন নবী (সা) হযরত সাদ ইবনে মুআযের (রা) চেহারায় কিছু বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে সাদ! মনে হচ্ছে, লোকদের এ কাজ তোমার পছন্দ হচ্ছে না। তিনি জবাব দিলেন "ঠিকই, হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের সাথে এ প্রথম যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করেছেন। কাজেই এ সময় বন্দী করে তাদের প্রাণ বাঁচাবার চাইতে বরং তাদেরকে চরমভাবে গুড়িয়ে দিলেই বেশী ভাল হতো"

জিহাদ ও আক্রমণ: ৮৫

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৭০

হে নাবী! **তোমাদের হাতে যে সব যুদ্ধবন্দী আছে তাদেরকে বল, 'আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে ভাল কিছু দেখেন তাহলে তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণ) যা নেয়া হয়েছে তাথেকে উত্তম কিছু তোমাদেরকে তিনি দান করবেন আর তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।** আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।'

জিহাদ ও আক্রমণ: ৮৬

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৭১

আর যদি তারা তোমার সাথে খিয়ানাত করার ইচ্ছে করে (তবে সেটা অসম্ভব কিছু নয়, কারণ এর থেকেও গুরুতর যে) তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে খিয়ানাত করেছে, **কাজেই আল্লাহ তাদেরকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন।** আল্লাহ সর্ববিষয়ে বিশেষভাবে অবগত, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৮৭

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৭২

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, **স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে** এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা

দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সেসবই দেখেন।

তাফসীর বলে

এ আয়াতটি ইসলামের সাংবিধান আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এখানে একটি মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে, অভিভাবকত্বের সম্পর্ক এমন সব মুসলমানদের মধ্যে স্থাপিত হবে যারা দারুল ইসলামের বাসিন্দা অথবা বাইর থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে এসেছে। আর যেসব মুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে বাস করে তাদের সাথে অবশ্যি ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু অভিভাকত্বের সম্পর্ক থাকবে না। অনুরূপভাবে যেসব মুসলমান হিজরত করে দারুল ইসলামে আসবে না বরং দারুল কুফরের প্রজা হিসেবে দারুল ইসলামে আসবে তাদের সাথে ও সম্পর্ক থাকবে না। অভিভাকত্ব শব্দটিকে এখানে মূলে ওয়ালায়াত শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আরবীতে ওয়ালায়াত ,অভিভাকত্ব বলতে সাহায্য সহায়তা, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা, মৈত্রী ,বন্ধুত্ব, নিকট আত্মীয়তা, অভিভাবকত্ব এবং এ সবের সাথে সামঞ্জস্যশীল অর্থ বুঝায়। এ আয়াতের পূর্বাপর আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে এ থেকে এমন ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝানো হয়েছে যা একটি রাষ্ট্রের তার নাগরিকদের সাথে, নাগরিকদের নিজেদের রাস্ট্রের সাথে এবং নাগরিকদের নিজেদের মধ্যে বিরাজ করে। কাজেই এ আয়াতটি "সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অভিভাকত্ব"কে ইসলামী রাস্ট্রের ভুখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এ সীমানার বাইরে মুসলমানদেরকে এ বিশেষ সম্পর্কের বাইরে রাখে। এ অভিভাবকত্ব না থাকার আইনগত ফলাফল অত্যন্ত ব্যাপক।এখানে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। উদাহরণ হিসেবে শুধুমাত্র এতটুকু ইংগিত করাই যথেষ্ট হবে যে, এ অভিভাবকত্বহীনতার ভিত্তিতে এ দারুল কুফর ও দারুল ইসলামের মুলমানরা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এবং তারা একজন অন্যজনের আইনগত অভিভাবকত্ব হতে পারে না, পরস্পরের মধ্যে বিয়ে -শাদী করতে পারে না এবং দুরুল কুফরের সাথে নাগরিকত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করেনি এমন কোন মুসলমানকে ইসলামী রাষ্ট্র নিজেদের কোন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত করতে পারে না।

তাছাড়া এ আয়াতটি ইসলামী রাষ্ট্রের বিদেশ নীতির ওপরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। এর দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যেসব মুসলমান অবস্থান করে তাদের দায়িত্বই ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। বাইরের মুসলমানদের কোন দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বার্তায় না। একথাটিই নবী (সা) তার নিম্নোক্ত হাদীসে বলেছেনঃ -----------অর্থাৎ "আমার ওপর এমন কোন মুসলমানদের সাহায্য সমর্থন ও

হেফাজতের দায়িত্ব নেই যে মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে" । এভাবে সাধারণত যেসব বিবাদের কারণে আন্তর্জাতিক জটিলতা দেখা দেয় ইসলামী আইন তার শিকট কেটে দিয়েছে। কারণ যখনই কোন সরকার নিজের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে অবস্থানকারী কিছু সংখ্যালঘুর দায়িত্ব নিজের মাথায় নিয়ে নেয় তখনই এর কারণে এমন সব জটিলতা দেখা দেয় বার বার যুদ্ধের পরও যার কোন মীমাংসা হয় না।

আয়াতে দারুল ইসলামের বাইরে অবস্থানকারী মুসলমানদের রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের সম্পর্ক মুক্ত গন্য করা হয়েছিল। এখন এ আয়াতটি বলছে যে, তারা এ সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করা সত্ত্বেও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করেছে না। যদি কোথাও তাদের ওপর জুলুম হতে থাকে এবং ইসলামী ভ্রাতৃ সমাজের সাথে সম্পর্কের কারণে তারা দুরুল ইসলামের সরকারের ও তার অধিবাসীদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে নিজদের এ মজলুম ভাইদের সাহায্য করা তাদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। কিন্তু এরপর আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে , চোখ বন্ধ করে এসব দীনী ভাইদের সাহায্য করা যাবে না।বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরোপিত দায়িত্ব ও নৈতিক সীমারেখার প্রতি নজর রেখেই এ দায়িত্ব পালন করা যাবে। জুলমকারী জাতির সাথে যদি সীমারেখার রাষ্ট্রের চুক্তিমূলক সম্পর্ক থাকে তাহলে এ অবস্থায় এ চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব ক্ষুন্ন করে মজলুম মুসলমানদের কোন সাহায্য করা যাবে না।

আয়াতে চুক্তির জন্যে ----(মীসাক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে -----'ওসুক'। এর মানে আস্থা ও নির্ভরতা। এমন প্রত্যেকটি জিনিসকে "মীসাক" বলা হবে যার ভিত্তিতে কোন জাতির সাথে আমাদের সুস্পষ্ট যুদ্ধ নয় চুক্তি না থাকলেও তারা প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদেরও তাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ নেই এ ব্যাপারে যথার্থ আস্থাশীল হতে পারে।

তারপর আয়াতে বলা হয়েছে -----------অর্থাৎ তোমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি থাকে এ থেকে পরিস্কার জানা যাচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার কোন অমুসলিম সরকারের সাথে যে চুক্তি স্থাপন করে তা শুধুমাত্র দুটি সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক নয় বরং দুটি জাতির সম্পর্কও এবং মুসলমান সরকারের সাথে সাথে মুসলিম জাতি ও তার সদস্যরাও এর নৈতিক দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। মুসলিম সরকার অন্য দেশ বা জাতির সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করে ইসলামী শরীয়াত তার নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুসলিম জাতি বা তার ব্যক্তিবর্গকে মুক্ত থাকার আদৌ বৈধ গণ্য করে না। তবে দারুল ইসলাম সরকারের চুক্তিগুলো মেনে চলার দায়িত্ব একমাত্র তাদের ওপর বর্তাবে যারা এ রাষ্ট্রের কর্মসীমার মধ্যে অবস্থান করবে। এ সীমার বাইরে বসবাসকারী সারা দুনিয়ার মুসলমানরা কোনক্রমেই এ দায়িত্বে শামিল হবে না। এ কারণেই হোদাইবিয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কাফেরদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন হযরত আবু বুসাইর ও আবু জানদাল এবং অন্যান্য মুসলমানদের ওপর তার কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়নি, যারা মদীনার দারুল ইসলামের প্রজা ছিলেন না।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৮৮

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৭৩

আর যারা কুফরী করে তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না কর (অর্থাৎ তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আস) তাহলে দুনিয়াতে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

তাফসীর বলে

সবচেয়ে কাছের বাক্যটির সাথে যদি এ বাক্যটির সম্পর্ক মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, যেভাবে কাফেররা পরস্পর সাহায্য -সমর্থন করে, তোমরা ঈমানদাররা যদি সেভাবে পরস্পরের সাহায্য -সমর্থন না করো তাহলে পৃথিবীতে বিরাট ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর যদি ৭২ আয়াত থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যতগুলো হেদায়াত দেয়া হয়েছে তার সবগুলোর সাথে যদি এর সম্পর্ক মেনে নেয়া হয় তাহলে এ উক্তির অর্থ হবেঃ যদি দারুল ইসলামের মুসলমানরা পরস্পরের অলী ও অভিভাবক না হয়, হিজরত করে যেসব মুসলমান দারুল ইসলামের আসেনি এবং যেসব মুলমান দারুল কুফলে বসবাস করছে তাদেরকে যদি দারুল ইসলামের অধিবাসীরা নিজেদের রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব বহির্ভূত মনে না করে, যদি বাইরের মজলুম মুসলমানদের সাহায্য চাওয়ার পর তাদের সাহায্য না করা হয়, আর যদি এ সংগে যে জাতির সাথে মুসরমানদের চুক্তি থাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যের আবেদনকারী মুসলমানদের সাহায্য না করার নীতিও না মেনে চলা হয় এবংযদি মুসলমানরা কাফেরদের সাথে সহযোগিতায় সম্পর্ক খতম না করে, তাহলে পৃথিবীতে বিরাট ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৮৯

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৭৪

যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত (নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে) করেছে, **আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহযোগিতা করেছে- তারাই প্রকৃত ঈমানদার।** তাদের জন্য আছে ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৯০

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৭৫

যারা পরে ঈমান এনেছে, **হিজরাত করেছে আর তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে, এসব লোক তোমাদেরই মধ্যে গণ্য।** কিন্তু আল্লাহর বিধানে রক্ত সম্পর্কীয়গণ পরস্পর পরস্পরের নিকট অগ্রগণ্য। আল্লাহ সকল বিষয়ে সবচেয়ে বেশী অবগত।

তাফসীর বলে

এর মানে হচ্ছে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তেতে তাদের পরস্পরের উত্তরাধিকার বন্টন করা হবে না। বংশধারা ও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে যেসব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় দীনী ভাইরা পরস্পরের ব্যাপারে সেসব অধিকারও লাভ করবে না। এসব ব্যাপারে ইসলামি সম্পর্কের পরিবর্তে আত্মীয়তার সম্পর্কই আইনগত অধিকারের ভিত্তির কাজ **করবে। হিজরতের পর নবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করেছিলেন তার ফলে এ দীনী ভাইরা পরস্পরের ওয়ারিসও হবে বলে কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছিলেন।** তাদের এ ভাবনা যে ঠিক নয় তা বুঝাবার জন্যে আল্লাহ একথা বলছেন।

অধ্যায়-০৬: সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) (অনুশোচনা)

জিহাদ ও আক্রমণ: ৯১

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৫

তারপর (এই) নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে **মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে ঘেরাও কর, তাদের অপেক্ষায় প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওৎ পেতে বসে থাক।** কিন্তু তারা যদি তাওবাহ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।

তাফসীর বলে

পারিভাষিক অর্থে যে মাসগুলোকে হজ্জ ও উমরাহ করার সুবিধার জন্য হারাম মাস গণ্য করা হয়েছে এখানে সে মাসগুলোর কথা বলা হয়নি। বরং মুশরিকদের যে চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়েছিল সেই চারটি মাসের কথা এখানে বলা হযেছে। যেহেতু এ অবকাশকালিন সময়ে মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয ছিল না তাই এগুলোকে হারাম মাস বলা হয়েছে।

অর্থাৎ **কুফর ও শিরক থেকে নিছক তাওবা করে নিলেই ব্যাপাটি খতম হয়ে যাবে না।** বরং তাদের কার্যত নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে হবে। এটা না হলে তারা যে কুফরী ত্যাগ করে ইসলামকে অবলম্বন করেছে, একথা মেনে নেয়া যাবে না। হযরত আব বকর (রা) মুরতাদ হবার ফিতনা দেখা দেবার সময় এ আয়াত থেকেই যুক্তি সংগ্রহ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নবী (সা) এর ইন্তেকালের পর যারা গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল তাদের একটি দল বলতো, আমরা ইসলামকে অস্বীকার করি না। আমরা নামায পড়তে প্রস্তুত কিন্তু যাকাত দেবো না। সাহাবায়ে কেরাম সাধারনভাবে এ ভেবে বিব্রত হচ্ছিলেন, যে এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে কেমন করে তরবারি ওঠানো যেতে পারে। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) ও আয়াতটির বরাত দিয়ে বলেলেন, আমাদের তো কেবলমাত্র যখন এরা শিরক থেকে তাওবা

করবে, নামায কায়েম করবে, ও যাকাত দেবে তখনই এদেরকে ছেড়ে দেবার হুকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন এ তিন শর্তের মধ্য থেকে একটি শর্ত এরা উড়িয়ে দিচ্ছে তখন আমরা এদের ছেড়ে দেই কেমন করে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৯২

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ১২

তারা যদি চুক্তি করার পর তাদের শপথ ভঙ্গ করে আর তোমাদের দীনের বিরুদ্ধে কটুক্তি করে, তাহলে **কাফিরদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াই কর,** শপথ বলে কোন জিনিস তাদের কাছে নেই, (কাজেই শক্তি প্রয়োগ কর) যাতে তারা (শয়ত্বানী কার্যকলাপ থেকে) নিবৃত্ত হয়।

তাফসীর বলে

পূর্বাপর আলোচনা থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা বুঝা যাচ্ছে যে, **কসম, অঙ্গীকার ও শপথ বলতে কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অংগীকারের কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে।** কারণ এদের সাথে এখন আর কোন চুক্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। আগের সমস্ত চুক্তিই তরা ভংগ করেছে। তাদের অংগীকার ভংগের কারণেই আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ তেকে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিষ্কার ঘোষণা শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে, এ ধরনের লোকদের সাথে কেমন করে চুক্তি করা যেতে পারে। এ সাথে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছিল যে, এখন তারা কুফরী ও শিরক ত্যাগ করে নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে, একমাত্র এ নিশ্চয়তা বিধান করলেই তাদের ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। এ কারণে **এ আয়াতটি মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একেবারেই দ্ব্যর্থহীন আদেশ স্বরূপ।** আসলে দেড় বছর পরে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফত আমলে ইসলাম বর্জনের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল এখানে সেদিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।অতিরিক্ত ও বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আমার বই ইসলামী আইনে মুরতাদের শাস্তি।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৯৩

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ১৩

তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করবেনা যারা নিজেদের শপথগুলিকে ভঙ্গ করেছে, আর রাসূলকে দেশান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রথমে আক্রমণ করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ? বস্তুতঃ আল্লাহকেই তোমাদের ভয় করা উচিত, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।

তাফসীর বলে

এখান থেকে ভাষণটি মুসলমানদের দিকে মোড় নিচ্ছে। তাদেরকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং দীনের ব্যাপারে কোন প্রকার সম্পর্ক, নিকট আত্মীয়তা ও বৈষয়িক সুবিধার কথা একটুও বিবেচনায় না আনার কঠোর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ভাষণের এ অংশটির সমগ্র প্রাণসত্তা ও মর্ম অনুধাবন করার জন্য সে সময় যে অবস্থা ও পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তা আর একবার ভেবে দেখা দরকার। সন্দেহ, নেই, ইসলাম এ সময় দেশের একটি বড় অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আরবে এমন কোন বড় শক্তি তখন ছিল না, যে তাকে শক্তি পরিক্ষার আহবান জানাতে পারতো। তবুও এ সময় যে সিদ্ধান্তকর ও চরম বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল স্থুল দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা তাতে অনেক বিপদের ঝুঁকি দেখতে পাচ্ছিল।

একঃ **সমস্ত মুশরিক গোত্রগুলোকে একই সঙ্গে সকল চুক্তি বাতিল করার চ্যালেঞ্জ দিয়ে দেয়া, মুশরিকদের হজ্জ বন্ধ করে দেয়া, কাবার অভিভাবকের পরিবর্তন এবং জাহেলী রসম রেওয়াজের একেবারেই মুলোৎপাটন -এসবের অর্থ ছিল একই সংগে সারাদেশে আগুণ জ্বলে ওঠবে এবং মুশরিক ও মুনাফিকরা নিজেদের স্বার্থ ও গোত্রীয় বৈশিষ্ট্যের হেফাজতের জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত প্রবাহিত করতে উদ্দূদ্ধ হবে।**

দুইঃ হজ্জকে শুধুমাত্র তাওহীদবাদীদের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং মুশরিকদের জন্য কাবা ঘরের পথ রুদ্ধ করে দেয়ার অর্থ ছিল, দেশের জনসংখ্যার যে একটি বিরাট অংশ তখনো মুশরিক ছিল, ধর্মীয় কাজ কর্মে জন্য তাদের কাবাঘরে আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু এ নয়, সমকালীন আরবের অর্থনৈতিক জীবনে কাবার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং কাবার ওপর আরবদের অর্থনৈতিক জীবন বিপুলভাবে নির্ভরশীল ছিল। কাজেই এভাবে কাবার দরজা বন্ধ করার কারণে তারা কাবাঘর থেকে কোন প্রকার অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভ করতে পারবে না।

তিনঃ যারা হোদায়বিয়ার চুক্তি ও মক্কা বিজয়ের পর ঈমান এনেছিলেন তাদের জন্য এটি ছিল কঠিন পরীক্ষার বিষয়। কারণ তাদের অনেক জ্ঞাতি-ভাই, আত্মীয় -স্বজন তখনো মুশরিক ছিল।তাদের মধ্যে এমন অনেক লোকও ছিল পুরাতন ব্যবস্থার বিভিন্ন পদমর্যাদার সাথে যাদের স্বার্থ বিজরিত ছিল।এখন বাহ্যত আরবের মুশরিকদের গোটা সমাজ ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন করে দেবার যে আয়োজন চলছিল তার মানে ছিল মুসলমানরা নিজেদের হাতেই নিজেদের বংশ, পরিবার ও কলিজার টুকরাদেরকে ধুলায় মিশিয়ে দেবে এবং তাদের মান, মর্যাদা, ও শতশত বছরের প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিরতরে খতম করে দেবে।

যদিও বাস্তবে এর মধ্যে থেকে কোন একটা বিপদও কার্যত সংঘটিত হয়নি। দায় মুক্তির ঘোষণার পর সারা দেশে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠার পরিবর্তে বরং দেশের বিভিন্ন এলাকায় যেসব মুশরিক গোত্র এতদিন নির্লিপ্ত ছিল তাদের এবং বিভিন্ন আমীর, রইস ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি দল মদীনায় আসতে শুরু করলো। তারা নবী (সা) এর সামনে ইসলাম গ্রহণ করে আনুগত্যের শপথ নিতে লাগলো। ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী (সা) তাদের প্রত্যেককে নিজের পদমর্যাদায় বহাল রাখলেন। কিন্তু এ নতুন নীতি ঘোষণা করার সময় তার এ ফলাফলকে কেউ আগাম অনুমান করতে পারেনি। তাছাড়া এ ঘোষণার সাথে সাথেই যদি মুসলমানরা শক্তি প্রয়োগ করে তা বস্তাবায়িত করার জন্য পুরোপুরি তৈরী না হয়ে যেতো, তাহলে সম্ভবত এ ধরনের ফলাফল দেখাই যেতো না। **কাজেই এ সময় মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দীপনা ও আবেগ সৃষ্টি করা এবং এ নীতি কার্যকর করতে গিয়ে তাদের মনে যেসব আশংকা দেখা দিয়েছিল সেগুলো দূর করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এ সংগে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তাদের কোন জিনিসের পরোয়া না করা উচিত।** এ বক্তব্যই আলোচ্য ভাষণের মূল প্রতিপদ্য বিষয়।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৯৪

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ১৪

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, **আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন** এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৯৫

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ১৬

তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহতো এখনও তোমাদেরকে পরীক্ষা করেননি যে, **কারা তোমাদের মধ্য হতে জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ ছাড়া অন্য কেহকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করেনি?** আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

তাফসীর বলে

স্বল্পকাল আগে যারা ইসলাম গ্রহন করেছিল এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে, যতক্ষণ তোমরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একথা প্রমাণ করে না দেবে যে, **যথার্থই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনকে নিজেদের ধন-প্রাণ ও ভাই -বন্ধুদের তুলনায় বেশী ভালবাসো, ততক্ষণ তোমাদের সাচ্চা মুমিন বলে গণ্য করা যেতে পারে না।**

এ পর্যন্ত বাহ্যত তোমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যেহেতু সাচ্চা মুমিন ও প্রথম যুগের দৃঢ়চিত্ত মুসলিমদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলাম বিজয় লাভ করছে এবং সারাদেশে ছেয়ে গেছে তাই তোমরাও মুসলমান হয়ে গেছো।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৯৬

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ১৯

তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ **যারা আল্লাহ ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে? তারা আল্লাহর সমীপে সমান নয়;** যারা সীমা লংঘনকারী তাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেননা।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ কোন তীর্থ কেন্দ্রে পূর্বপুরুষদের গদিনশীন হওয়া, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এমন কিছু লোকদেখানো ধর্মীয় কাজ করা যার ওপর লোকেরা বৈষয়িক পর্যায়ে সাধারণত মর্যাদা ও পবিত্রতার ভিত গড়ে তোলে আল্লাহর কাছে এগুলোর কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। **আল্লাহর পতি ঈমান আনা ও তার পথে কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করাই যথার্থ মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী।** যে ব্যক্তি এসব গুণের অধিকারী হয়, সে কোন উচ্চ বংশ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে সম্পর্কিত না হলেও এবং তার কপালে কোন বিশেষ গুণের তকমা, আটা না থাকলেও সে-ই যথার্থ মর্যাদাবান ব্যক্তি। কিন্তু যারা এসব গুণের অধিকারী নয়, তারা নিছক বিরাট সম্মানিত ও বুজর্গ ব্যক্তির সন্তান, দীর্ঘকাল থেকে তাদের পরিবারে গদিনশীনী প্রথা চলে আসছে এবং বিশেষ সময়ে তারা বেশ ধুমধাম সহকারে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকে বলেই কোন প্রকার মর্যাদার অধিকারী হবে না। উপরন্তু এ ধরনের মেকী মৌরুসী অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে পবিত্র স্থানসমূহ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ অযোগ্য ও অপাংক্তেয় লোকদের হাতে রেখে দেয়াও কোনক্রমেই বৈধ হতে পারে না।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৯৭

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ২০

যারা ঈমান এনেছে ও হিজরাত করেছে, **আর নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা মর্যাদায় আল্লাহর কাছে অতি বড়,** আর তারাই হচ্ছে পূর্ণ সফলকাম।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৯৮

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ২৪

(হে নাবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ অথবা ঐ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ, **আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে যদি (এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন।** আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ **তোমাদের হটিয়ে দিয়ে সেখানে আল্লাহ অন্য কোন দলকে দীনের নিয়ামত দান করবেন। তদেরকে দীনের ধারক ও বাহক হবার মর্যাদায় উন্নীত করবেন।** এ সংগে মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করার নেতৃত্বও তাদের হাতে সোপর্দ করবেন।

জিহাদ ও আক্রমণ: ৯৯

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ২৫

অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে (যুদ্ধে) বহু ক্ষেত্রে বিজয়ী করেছেন এবং হুনাইনের দিনেও (তাঁর সাহায্যের অভাবনীয় রূপ তোমরা দেখছো)। যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উন্মত্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে

আসেনি, আর ভূ-পৃষ্ঠ প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গেল, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করলে।

তাফসীর বলে

দায়িত্ব মুক্তি ও সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা সম্বলিত ভয়ংকর নীতি কার্যকর করার ফলে সারা আরবে সর্বত্র যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে এবং তার মোকিবালা করা অসম্ভব হবে বলে যারা আশংকা করছিল তাদেরকে বলা হচ্চে, এসব অমুলক ভয়ে ভীত হচ্ছো কেন। এর চাইতেও বেশী কঠিন বিপদের সময় যে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন তিনি এখনো তোমাদের সাহায্য করার জন্য রয়েছেন। **এ কাজ যদি তোমাদের শক্তির ওপর নির্ভর করতো তাহলে এর আর মক্কা সীমানা পার হতে হতো না। আর না হোক, বদরের ময়দানে তো খতমই হয়ে যেতো।** কিন্তু এর পেছনে তো রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর শক্তি। আর অতীতের অভিজ্ঞতাসমূহ তোমার কাছে একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এখনো পর্যন্ত আল্লাহর শক্তিই এর উন্নতি ও বিকাশ সাধন করে এসেছে। কাজেই নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো, আজো তিনিই একে উন্নতি ও অগ্রগতি দান করবেন।

এখানে হুনায়েন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে । এ যুদ্ধটি ৮ হিজরীর শওয়াল মাসে এ আয়াতগুলো নাযিলের মাত্র বার তের মাস আগে মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে হুনায়েন উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ছিল ১২ হাজার সৈন্য। এর আগে কোন যুদ্ধে মুসলমানদের এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য জামায়েত হয়নি। অন্যদিকে কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এর তুলানায় অনেক কম। কিন্তু এ সত্ত্বেও হাওয়াযিন গোত্রের তীরন্দাজরা যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিল। মুসলিম সেনাদলে মরাত্মক বিশৃংখলা দেখা দিল। তারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হযে পিছু হটতে লাগলো। এ সময় শুধুমাত্র নবী (সা) এবং মুষ্টিমেয় কতিপয় মরণপণ সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ ছিলেন।তাদের অবিচলতার ফলেই সেনাবাহিনী পুনর্বার সংগঠিত হলো এবং মুসলমানরা বিজয় লাভ করলো। অন্যথায় মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানরা যে পরিমাণে লাভবান হয়েছিল হুনায়েনে তাদেরকে তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হতে হতো ।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১০০

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ২৬

অতঃপর আল্লাহ নিজ রাসূলের প্রতি এবং অন্যান্য মু'মিনদের প্রতি তাঁর সাকিনা (প্রশান্তি) নাযিল করলেন এবং **এমন সৈন্যদল (অর্থাৎ ফেরেশতা) নাযিল করলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি, আর কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন;** আর এটা হচ্ছে কাফিরদের কর্মফল।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১০১

সূরা আত তাওবাহ্‌ (০৯) আয়াত ২৯

যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, আর শেষ দিনের প্রতিও না, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম গণ্য করে না, আর সত্য দ্বীনকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না **তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা সহকারে স্বেচ্ছায় জিযিয়া (ট্যাক্স) দেয়।**

তাফসীর বলে

যদিও আহলি কিতাবরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখার দাবীদার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, না আখেরাতের প্রতি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ আছে একথা মেনে নেয়া নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ও একমাত্র রব বলে মেনে নেবে এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, অধিকার, ও ক্ষমতায় নিজেকে বা অন্য কাউকে শরীক করবেনা। কিন্তু খৃস্টান ও ইহুদীরা এ অপরাধে লিপ্ত। পরবর্তী পর্যায়ের আয়াতগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই তাদের আল্লাহকে মেনে নেয়ার কথাটা অর্থহীন। একে কোনক্রমেই ঈমান বিল্লাহ বলা যেতে পারে না। অনুরূপভাবে আখেরাতকে মানার অর্থ মরে যাওয়ার পর আমাদের আবার উঠানো হবে, শুধু এতটুকু কথার স্বীকৃতি দেয়া নয় বরং এ সংগে এ কথা মেনে নেয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, সেখানে কোন চেষ্টা তদবীর ও সুপারিশ করা, জরিমানা দেয়া এবং কোন বুজর্গ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ও বন্ধন কোন কাজে লাগবে না। কেউ কারোর পাপের কাফ্ফারা হবে না। আল্লাহর আদালতে ইনসাফ হবে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন এবং মানুষের ঈমান ও আমল ছাড়া আর কোন জিনিসকে মোটেই মূল্য দেয়া হবে না। এরূপ বিশ্বাস ছাড়া আখেরাতকে মেনে নেয়া অর্থহীন। কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানরা এ দিক দিয়েই নিজেদের ঈমান আকিদা নষ্ট করে ফেলেছে। **কাজেই তাদের আখেরাতের প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।**

অর্থাৎ আল্লাহ তার রসূলের মাধ্যমে যে শরীয়াত নাযিল করেছেন তাকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না।

অর্থাৎ তারা ঈমান আনবে ও আল্লাহর সত্য দীনের অনুসারী হয়ে যাবে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তা নয়। বরং **যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ হচ্ছেঃ তাদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য খতম হয়ে যাবে। তারা পৃথীবীতে শাসন ও কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।** বরং পৃথিবীতে মানুষের জীবন ব্যবস্থা লাগাম এবং মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করা ও তাদের নেতৃত্ব দান করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সত্যের অনুসারীদের হাতে থাকবে এবং তারা এ সত্যের অনুসারীদের অধীনে অনুগত জীবন যাপন করবে।

যিম্মীদেরকে ইসলামী শাসনের আওতায় যে নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ দান করা হবে তার বিনিময়কে জিযিয়া বলা হয়। তাছাড়া তারা যে হুকুম মেনে চলতে এবং ইসলামী শাসনের আওতাধীনে বসবাস করতে রাজী হয়েছে, এটা তার একটি আলামত হিসেবেও চিহ্নিত হবে। **নিজের হাতে জিযিয়া দেয় এর অর্থ হচ্ছে, সহজ, সরল আনুগত্যের ভংগিতে জিযিয়া আদায় করা। আর পদানত হয়ে থাকে এর অর্থ, পৃথিবীতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের নয় বরং যে মুমিন ও মুসলিমরা আল্লাহর খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করছে তাদের হাতে থাকবে।**

প্রথমদিকে ইহুদীও খ্রীষ্টানের কাছ থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নবী (সা) নিজে মাজুসীদের (অগ্নিউপাসক) থেকে জিযিয়া আদায় করে তাদেরকে যিম্মী করেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে আরবের বাইরের সব জাতির ওপর সাধারণভাবে এ আদেশ প্রয়োগ করেন।

ঊনিশ শতকে মুসলিম মিল্লাতের পতন ও অবনতির যুগে এ জিযিয়া সম্পর্কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বড় বড় সাফাই পেশ করা হতো। সেই পদাংক অনুসারী কিছু লোক এখনো রয়েছে এবং তারা এখনো এ ব্যাপারে সাফাই গেয়ে চলেছে। কিন্তু আল্লাহর দীন এসবের অনেক ঊর্ধে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহের ভুমিকায় অবতীর্ণ, তাদোর কাছে কৈফিয়ত দান ও ওযর পেশ করার তার কোন প্রয়োজন নেই। পরিষ্কার, ও সোজা কথায়, যারা আল্লাহর দীনকে গ্রহণ করে না এবং নিজেদের বা অন্যের উদ্ভাবিত ভূল পথে চলে, তারা বড় জোর এতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার রাখে যে, নিজেরা ভুল পথে চলতে চাইলে চলতে পারে, কিন্তু আল্লাহর যমীনে কোন একটি জায়গায়ও মানুষের ওপর শাসন চালাবার এবং নিজেদের ভ্রান্তি নীতি অনুযায়ী মানুষের সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করার আদৌ কোন অধিকার তাদের নেই। দুনিয়ার যেখানেই তারা এ জিনিসটি লাভ করবে সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।তাদেরকে এ অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে সৎ ও সত্যনিষ্ঠা জীবন বিধানের অনুগত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোই হবে মুমিনদের কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এ জিযিয়া কিসের বিনিময়ে দেয়। এর জবার হচ্ছে, ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের আওতাধিনে নিজেদের গোমরাহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য অমুসলিমদের যে স্বাধীনতা দান করা হয় এটা তারই মূল্য। আর যে সৎ ও সত্যানিষ্ঠা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তাদের এ স্বাধীনতাকে কাজে লাগাবার অনুমতি দেয় এবং তাদের অধিকার সংরক্ষন করে তার শাসণ ও আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনায় এ অর্থ ব্যয়ীত হওয়া উচিত। এর সবচেয়ে বড় ফায়দা হচ্ছে এই যে, জিযিয়া আদায় করার সময় প্রতি বছর যিম্মীদের মধ্যে একটা অনুভুতি জাগতে থাকবে। প্রতি বছর তারা মনে করতে থাকবে,তারা আল্লাহর পথে যাকাত দেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত আর এর পরিবর্তে গোমরাহীও ভ্রষ্টতার ওপর প্রতিষ্টিত থাকার জন্য তাদের মূল্য দিতে হচ্ছে। এটা তাদের কত বড় দুর্ভাগ্য। এ দুর্ভাগ্যের কারাগারে তারা বন্দী।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১০২

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৩৬

নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি। এর মধ্যে বিশেষ রূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত। এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। **অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করনা, আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে।** আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ যখন আল্লাহ চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই এ হিসাবও চলে আসছে যে, প্রতি মাসে প্রথমার চাঁদ একবারই উঠে। এ হিসাবে এক বছরে ১২ মাস হয়। একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের লোকেরা 'নাসী'র কারণে ১৩ বা ১৪ মাসে বছর বানিয়ে ফেলতো। যে হারাম মাসকে তারা হালাল করে নিয়েছে তাকে এভাবে বছরের পঞ্জিকায় জায়গা দেবার ব্যবস্থা করতো। সামনের দিকেও এ বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা করা হবে।

অর্থাৎ **যেসব উপযোগিতা ও কল্যাণকারিতার ভিত্তিতে এ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা হারাম করা হয়েছে সেগুলোকে নষ্ট করো না। এবং এ দিনগুলোতে শান্তি ভংগ করে বিশৃংখলা ছড়িয়ে নিজেদের ওপর জুলুম করো না। চারটি হারাম মাস বলতে যিলকদ্দ, যিল হজ্জ ও মহররম মাসে হজ্জের জন্যে এবং উমরাহের জন্য রজব মাস।**

অর্থাৎ মুশরিকরা যদি উল্লেখিত মাসগুলোতে লড়াই থেকে বিরত না হয় তাহলে তারা যেমন একমত ও একজোট হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়েছে, **তোমরাও তেমনি একমত ও একজোট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়ো।** সূরা আল বাকারার ১৯৪ আয়াতটির এর ব্যাখ্যা পেশ করেছে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১০৩

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৩৮

হে মু'মিনগণ! তোমাদের কি হল যে, **যখন তোমাদেরকে বলা হয়, বের হও আল্লাহর পথে, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক (অলসভাবে বসে থাক)।** তাহলে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসতো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য।

তাফসীর বলে

তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলাকালে যে ভাষণটি নাযিল হয়েছিল এখান থেকে সেটিই শুরু হচ্ছে।

এর দুটো অর্থ হতে পারে। এক, আখেরাতের অনন্ত জীবন ও সেখানকার সীমা-সংখ্যাহীন সাজ সরঞ্জাম দেখার পর তোমরা জানতে পারবে, দুনিয়ার সামান্য জীবনকালে সুঐশ্বর্য ভোগের যে বড় বড় সম্ভবনা তোমাদের করায়ত্ব ছিল এবং যে সর্বাধিক পরিমানে বিলাস সামগ্রী তোমরা লাভ করতে পেরেছিলে তা আখেরাতের সেই সীমাহীন সম্ভবনা এবং সেই অন্তহীন নিয়ামতে পরিপূর্ণ সুবিশাল রাজ্যের তুলনায় কিছুই নয়। তখন তোমরা নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও অদূরদর্শিতার জন্য এ মর্মে আফসোস করতে থাকবে, যে, আমরা হাজার বুঝানো সত্ত্বেও দুনিয়ার তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী লাভের মোহে তোমরা কেন নিজেদেরকে এ চিরন্তন ও বিপুল পরিমাণ লাভ থেকে বঞ্চিত রাখলে। দুই, দুনিয়ার জীবনের সামগ্রি আখেরাতে কোন কাজে লাগবে না। এখানে যতই ঐশ্বর্য সম্পদ ও সাজ-সরঞ্জাম তোমরা সংগ্রহ করো না কেন, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথেই সব কিছু থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে। মৃত্যুর পরপারে যে জগত রয়েছে এখানকার কোন জিনিসই সেখানে তোমাদের সাথে স্থানান্তরিত হবে না। এখানকার জিনিসের যে অংশটুকু তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুরবানী করেছো এবং যে জিনিসকে ভালবাসার ওপর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছো একমাত্র সেই অংশই তোমরা সেখানে পেতে পারো।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১০৪

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৩৯

যদি তোমরা বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা আল্লাহর (দীনের) কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

তাফসীর বলে

এ থেকেই শরীয়াতের এ বিধি জানা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সাধারণ ঘোষণা (যুদ্ধ করার জন্য সর্বসাধারণ মুসলমানদেরকে আহবান জানানো) না দেয়া হবে কিংবা কোন এলাকার সকল মুসলিম অধিবাসীকে বা মূলসমানদের কোন দলকে জিহাদের জন্য বের হবার হুকুম দেয়া না হবে ততক্ষণ তো জিহাদ ফরযে কিফায়াই থাকে। অর্থাৎ যদি কিছু লোক জিহাদ করতে থাকে তাহলে বাদবাকি লোকদের ওপর থেকে ঐ ফরয রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যখন মুসলমানদের শাসকের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে সর্বাত্মক জিহাদের জন্য আহবান জানানো হবে অথবা কোন বিশেষ দলকে বা বিশেষ এলাকার

অধিবাসীদেরকে ডাকা হবে তখন যাদেরকে ডাকা হয়েছে তাদের ওপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে **এমনকি যে ব্যক্তি কোন যথার্থ অসুবিধা বা ওযর ছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না তার ঈমানই গ্রহণযোগ্য হবে না।**

অর্থাৎ আল্লাহর কাজ তোমাদের উপর নির্ভরশিল নয়। তোমরা করলে তা হবে এবং তোমরা না করলে তা হবে না এমন নয়। আসলেআল্লাহ যে তোমাদের তাঁর দীনের খেদমতের সুযোগ দিচ্ছেন, এটা তাঁর মেহেরবানী ও অনুগ্রহ। যদি তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এ সুযোগ হারাও, তাহলে তিনি অন্য কোন জাতিকে এ সুযোগ দেবেন এবং তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১০৫

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৪১

যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে পড়, অবস্থা হালকাই হোক আর ভারীই হোক (অস্ত্র কম থাকুক আর বেশি থাকুক) আর আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের মাল দিয়ে আর তোমাদের জান দিয়ে জিহাদ কর, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, তোমরা যদি জানতে!

তাফসীর বলে

এখানে হালকা ও ভারী শব্দ দুটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ হচ্ছে, **বের হবার হুকুম যখন হয়ে গেছে তখন তোমাদের বের হয়ে পড়তে হবে। স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে হোক বা অনিচ্ছায় -অনাগ্রহে, সচ্ছলতায় ও সমৃদ্ধির মধ্যে হোক বা দারিদ্রের মধ্যে, বিপুল পরিমাণ সাজসরঞ্জাম থাক বা একাবারে নিঃসম্বল অবস্থায় হোক,** অনুকূল অবস্থা হোক বা প্রতিকূল অবস্থা, যৌবন ও সুস্বাস্থের অধিকরী হও, বা বৃদ্ধ দুর্বল হও, সর্বাবস্থায় বের হতে হবে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১০৬

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৪৪

যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে **তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করবে না,** আর আল্লাহ এই পরহেজগার লোকদের সম্বন্ধে খুবই অবগত আছেন।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১০৭

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৫২

বল, **‘তোমরা আমাদের জন্য যে জিনিসের অপেক্ষা করছ তা দু’টো ভালোর একটি ছাড়া আর কিছুই না (শাহাদাত কিংবা বিজয়)** আর আমরা অপেক্ষা করছি এজন্য যে, আল্লাহ নিজেই তোমাদেরকে শাস্তি দেন অথবা আমাদের হাত দিয়ে দেয়ান। কাজেই অপেক্ষায় থাক, আমরা তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।’

তাফসীর বলে

মুনাফিকরা তাদের অভাস অনুযায়ী এ সময়ও কুফর ও ইসলামের সংঘাতে অংশ না নিয়ে নিজেরা চরম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে বলে মনে করেছিল। এ সংঘাতের পরিণামে রসূল ও তার সাহাবীরা বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন, না রোমীদের সামরিক শক্তির সাথে সংঘর্ষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যান, দূরে বসে তারা তা দেখতে চাচ্ছিল। এখানে তাদের প্রত্যাশার জবাব দেয়া হয়েছিল। **বলা হয়েছে, দুটি ফলাফলের মধ্যে তোমরা একটির প্রকাশের অপেক্ষা করছো। অথচ ঈমানদারদের জন্য উভয় ফলাফলই যথার্থ ভাল ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নয়।** তারা বিজয়ী হলে, এটা যে তাদের জন্য ভাল একথা সবার জানা । **কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের পথে প্রাণ দান করে যদি তারা মাটিতে বিলীন হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়াবাসীরা তাদের চরম ব্যর্থ বলে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে এটিও আর এক রকমের সাফল্য।** কারণ মুমিন একটি দেশ জয় করলো কি করলো না অথবা কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত করলো কি না, এটা তার সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি নয়। বরং মুমিন তার আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য নিজের মন, মস্তিস্ক, দেহ ও প্রাণের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করেছে কিনা, এটাই তার মাপকাঠি। এ কাজ যদি সে করে থাকে তাহলে দুনিয়ার বিচারে তার ফলাফল শূণ্য হলেও আসলে সে সফলকাম।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১০৮

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৭৩

হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ (যুদ্ধ) কর, তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর, তাদের বাসস্থান হল জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!

তাফসীর বলে

তাবুক যুদ্ধের পর যে ভাষণটি নাযিল হয়েছিল এখান থেকে সেই তৃতীয় ভাষণটি শুরু হচ্ছে।

এ পর্যন্ত মুনাফিকদের কার্যকলাপের ব্যাপারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিল। এর দুটি কারণ ছিল। এক, তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের হাত এত বেশী শক্তিশালী হতে পারেনি, যে, বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে তারা ভেতরের শত্রুদের সাথেও লড়াই করতে পারতো। দুই, যারা সন্দেহ -সংশয়ে ডুবে ছিল ঈমান ও প্রত্যয় লাভ করার জন্য তাদেকে যথেষ্ট সুযোগ দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এ দুটি কারণ এখন আর বর্তমান ছিল না। মুসলিম শক্তি এখন সমগ্র আরব ভুখণ্ডকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছিল এবং আরবের বাইরের শক্তিগুলোর সাথে সংঘাতের সিলসিলা শুরু হতে যাচ্ছিল। এ কারণে ঘরের এ শত্রুদের মাথা গুড়ো করে দেয়া এখন সম্ভবও ছিল এবং অপরিহার্যও হয়ে পড়েছিল। তাহলে তারা আর বিদেশী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে দেশে আভ্যন্তরীণ বিপদ সৃষ্টি করতে পারতো না। তাছাড়া তাদেরকে ৯ বছর সময় দেয়া হয়েছিল চিন্তা-ভাবনা করার, বুঝার এবং আল্লাহরসত্য দীনকে যাচাই-পর্যালোচনা করার জন্য। তাদের মধ্যে যথার্থ কল্যাণ লাভের কোন আকাংখা থাকলে তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারতো। এরপর **তাদেরকে আরো বেশী সুযোগ সুবিধা দেয়ার মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও এবার জিহাদ শুরু করে দিতে হবে এবং এদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে উদার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে কঠোর নীতি অবলম্ব করতে হবে।** তাই বলে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও কঠোর নীতি অবলম্বন করার মানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয়। আসলে এর অর্থ হচ্ছে, তাদের মুনাফিকী মনোভাব ও কর্মনীতিকে এ পর্যন্ত যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং যে কারণে তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থেকেছে, সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের সমাজেরই একটি অংশ মেনে করেছে এবং তারা ইসলামী দল ও সংঘঠনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ও ইসলামী সমাজে মুনাফিকীর বিষ ছড়াবার যে সুযোগ পেয়েছে তা এখন ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। এখন যে ব্যক্তিই মুসলমানদের অন্তরভুক্ত হয়ে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করবে এবং যার কার্যধারা থেকে একথাও প্রকাশ হবে, যে সে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুনিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়, সর্বসমক্ষে তার মুখোশ খুলে দিতে হবে। এবং নিন্দা করতে হবে। মুসলিম সমাজে তার মর্যাদা ও আস্থা লাভের সকল প্রকার সুযোগ খতম করে দিতে হবে।তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। দলীয় পরামর্শের ক্ষেত্রে থেকে তাকে দূরে রাখতে হবে। আদালতে তার সাক্ষ অনির্ভরযোগ্য গণ্য করতে হবে। বড় বড় পদ ও মর্যাদার দরজা তার জন্য বন্ধ করে দিতে হবে। সভা-সমিতিতে তাকে গুরুত্ব দেবে না। প্রত্যেক মুসলমান তার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সে নিজে অনুভব করতে পারে যে, সমগ্র মুসলিম সমাজে কোথাও তার কোন মর্যাদা ও গুরুত্ব নেই এবং কারো অন্তরে তার জন্য এতটুকু সম্ভ্রমবোধও নেই। তারপর তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি কোন সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তার অপরাধ লুকানো যাবে না এবং তাকে ক্ষমা করা ও যাবে না। বরং সর্বসমক্ষে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দামা চালাতে হবে এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এ পর্যায়ে মুসলমানদেরকে এ নির্দেশটি দেয়ার প্রয়োজন ছিল । এ ছাড়া ইসলামী সমাজকে অবনতি ও পতনের আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ থেকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না।যে জামায়াত ও সংগঠন তার নিজের মধ্যে মুনাফিক ও বিশ্বাসঘাতকদেরকে লালন করে এবং যেখানে দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা হয়, তার নৈতিক অধপতন এবং সবশেষে পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া গত্যন্তর নেই। মুনাফিকী প্লেগের মতো একটি মহামারী।আর মুনাফিক হচ্ছে এমন একটি ইদুর যে এ মহামারীর জীবাণু বহন করে বেড়ায়। তাকে জনবসতির মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেয়ার অর্থ গোটা জনবসতিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। মুসলমানদের সমাজে একজন মুনাফিকদের মর্যাদা ও সম্ভ্রম লাভ করার অর্থ হলো হাজার হাজার মানুষকে বিশ্বাসঘাতকতা ও মুনাফিকী করতে দুঃসাহস যোগানো। এতে সাধারণ্যে এ ধারণা বিস্তার লাভ করে যে, এ সমাজে মার্যাদা লাভ করার জন্য আন্তরিকতা, সদিচ্ছা, ও সাচ্চা ঈমানদারীর কোন প্রয়োজন নেই।বরং মিথ্যা ঈমানদের প্রদর্শনীয় সাথে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করেও এখানে মানুষ ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে উঠতে পারে। একথাটিই রসূলুল্লাহ (সা) তার একটি সংক্ষিপ্ত জ্ঞনগর্ভ বক্তব্যের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

"যে ব্যক্তি কোন বিদআতপন্থীকে সম্মান করলো সে আসলে ইসলামের ইমারত ভেংগে ফেলতে সাহায্য করলো"

জিহাদ ও আক্রমণ: ১০৯

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৮১

(তাবুক অভিযানে) যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তারা রসূলের বিরোধিতায় বসে থাকাতেই আনন্দ প্রকাশ করেছিল আর **তাদের ধন-সম্পদ ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে তারা অপছন্দ করেছিল।** তারা বলেছিল, ‘গরমের মধ্যে অভিযানে বেরিও না’। বল, ‘জাহান্নামের আগুনই তাপে প্রচন্ডতম’। তারা যদি বুঝত!

জিহাদ ও আক্রমণ: ১১০

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৮৩

আল্লাহ যদি তোমাকে (মাদীনায়) তাদের কোন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন, অতঃপর তারা কোন জিহাদে বের হতে অনুমতি চায়, তাহলে তুমি বলে দাওঃ তোমরা কখনও আমার সাথী হয়ে বের হবেনা এবং **আমার সাথী হয়ে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে**

যুদ্ধও করবেনা; তোমরা পূর্বেও বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে। অতএব এখনো তোমরা ঐ সব লোকের সাথে বসে থাক যারা পশ্চাদবর্তী থাকার যোগ্য।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১১১

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৮৬

আর যখনই কুরআনের কোন অংশ এ বিষয়ে অবতীর্ণ করা হয় যে, **তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর তখন তাদের মধ্যকার সম্পদশালী ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় ও বলেঃ আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরাও এখানে অবস্থানকারীদের সাথে থেকে যাই।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১১২

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৮৮

কিন্তু রসূল আর তার সাথে যারা ঈমান এনেছে **তারা তাদের মাল দিয়ে এবং জান দিয়ে জিহাদ করে।** যাবতীয় কল্যাণ তো তাদেরই জন্য। সফলকাম তো তারাই।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১১৩

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৯২

তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই যারা তোমার কাছে যখন বাহন চাওয়ার জন্য এসেছিল তখন তুমি বলেছিলে, 'আমি তো তোমাদের জন্য কোন বাহন পাচ্ছি না'। তখন তারা ফিরে গেল, আর সে সময় তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল- এ দুঃখে যে, ব্যয় বহন করার মত কোন কিছু তাদের ছিল না।

তাফসীর বলে

যারা দীনের খেদমত করার জন্য সর্বক্ষণ উদগ্রীব থাকে তারা যদি কোন সত্যিকার অক্ষমতার কারণে অথবা উপায়-উপকরণ বা মাধ্যম যোগাড় না হওয়ার দরুণ কার্যত খেদমত করতে না পারে তাহলে মনে ঠিক তেমনি কষ্ট পায় যেমন কোন বৈষয়িক স্বার্থন্বেষী ব্যক্তির রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেলে অথবা

কোন বড় আকারের লাভের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে মনে কষ্ট হয়, তারা বাস্তবে কোন খেদমত না করলেও আল্লাহর কাছে খেদমতাকারী হিসেবেই গণ্য হবে। **কারণ তারা হাত পা চালিয়ে কোন কাজ করতে পারিনি ঠিকই কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে তারা সর্বক্ষণ কাজের মাধ্যেই থাকে। এ কারণে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় নবী (সা) তার সংগী -সাথীদেরকে সম্বোধন করে বলেন,**

মদীনায় কিছু লোক আছে যারা প্রতিটি উপত্যকা অতিক্রমকালে এবং প্রতিটি যাত্রার সময় তোমাদের সাথে থেকেছে।

সাহবীগণ আবাক হয়ে বলেন, মদীনায় অবস্থান করেই, বলেন, হ্যাঁ মদীনায় অবস্থান করেই। কারণ অক্ষমতা তাদেরকে আটকে রেখেছিল নয়তো, তারা নিজেরা থেকে যাবার লোক ছিল না।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১১৪

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ১১১

নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, **তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) নিহত হয়, এর কারণে (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে।** নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

তাফসীর বলে

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে ঈমানের যে ব্যাপারটা স্থিরকৃত হয় তাকে কেনাবেচা বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, ঈমান শুধুমাত্র একটা অতি প্রাকৃতিক আকীদা-বিশ্বাস নয়। বরং এটা একটি চুক্তি। এ চুক্তির প্রেক্ষিতে বান্দা তার নিজের প্রাণ ও নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়। আর এর বিনিময়ে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ওয়াদা কবুল করে নেয় যে, মরার পর পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম কেনা-বেচার তাৎপর্য ও স্বরূপ কি তা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

নিরেট সত্যের আলোকে বিচার করলে বলা যায় মানুষের ধন-প্রাণের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। কারণ তিনিই তার কাছে যা কিছু আছে সব জিনিসের স্রষ্টা। সে যা কিছু ভোগ ও ব্যবহার করেছে তাও তিনিই

তাকে দিয়েছেন। কাজেই এদিক দিয়ে তো কেনাবেচার কোন প্রশ্নেই ওঠে না। মানুষের এমন কিছু নেই, যা সে বিক্রি করবে। আবার কোন জিনিস আল্লাহর মালিকানার বাইরেও নেই, যা তিনি কিনবেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন একটি জিনিস আছে, যা আল্লাহ পুরোপুরি মানুষের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে তার ইখতিয়ার অর্থাৎ নিজের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (Free will and freedom of choice)। এ ইখতিয়ারের কারণে অবশ্যি প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মানুষ এ মর্মে স্বাধীনতা লাভ করে যে, সে চাইলে প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে পারে এবং চাইলে তা অস্বীকার করতে পারে। অন্য কথায় এ ইখতিয়ারের মানে এ নয় যে মানুষ প্রকৃত পক্ষে তার নিজের প্রাণের নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তির এবং দুনিয়ায় সে যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে, তার মালিক হয়ে গেছে। এ সংগে এ জিনিসগুলো সে যেভাবে চাইবে সেভাবে ব্যবহার করার অধিকার লাভ করেছে, একথাও ঠিক নয়। বরং এর অর্থ কেবল এতটুকুই যে, তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পক্ষে থেকে কোন প্রকার জোর -জবরদস্তি ছাড়াই সে নিজেরই নিজের সত্তার ও নিজের প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর আল্লাহর মালিকানা ইচ্ছা করলে স্বীকার করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের মালিক হয়ে যেতে পারে এবং নিজেই একথা মনে করতে পারে যে, সে আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজের ইখতিয়ার তথা স্বাধীন কর্মক্ষমতার সীমানার মধ্যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার রাখে। এখানেই কেনা-বেচার প্রশ্নটা দেখা দেয়। আসলে এ কেনা-বেচা এ অর্থে নয় যে, মানুষের একটি জিনিস আল্লাহ কিনতে চান, বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে , যে জিনিসটি আল্লাহর মালিকানাধীন যাকে তিনি আমানত হিসেবে মানুষের হাতে সোপর্দ করেছেন এবং যে ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকার বা অবিশ্বস্ত হবার স্বাধীনতা তিনি মানুষেকে দিয়ে রেখেছেন সে ব্যাপারে তিনি মানুষের দাবী করেন, আমার জিনিসকে তুমি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে (বাধ্য হয়ে নাও)। এ সংগে খেয়ানত করার যে স্বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি তা তুমি নিজেই প্রত্যাহার করো। এভাবে যদি তুমি দুনিয়ার বর্তমান অস্থায়ী জীবনে নিজের স্বাধীনতাকে (যা তোমার অর্জিত নয় বরং আমার দেয়া) আমার হাতে বিক্রি করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী চিরন্তন জীবনে এর মূল্য জান্নাতের আকারে তোমাকে দান করবো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেনা-বেচার এ চুক্তি সম্পাদন করে সে মুমিন। ঈমান আসলে এ কেনা-বেচার আর এক নাম। আর যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে অথবা অঙ্গীকার করার পরও এমন আচরণ করবে যা কেবলমাত্র কেনা-বেচা না করার অবস্থায় করা যেতে পারে সে কাফের। আসলে এ কেনা -বেচাকে পাস কাটিয়ে চলার পরিভাষিক নাম কুফরী। কেনা-বেচার এ তাৎপর্য ও স্বরূপটি অনুধাবন করার পর এবার তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা যাকঃ একঃ এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ মানুষকে দুটি বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। প্রথম পরীক্ষাটি হচ্ছে, তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবার পর সে মালিকাকে মালিক মনে করার এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের পর্যায়ের নেমে না আসার মতো সৎ আচরণ করে কিনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নিজের প্রভু ও মালিক আল্লাহর কাছ থেকে আজ নগদ যে মূল্য পাওয়া যাচ্ছে, না বরং মরার পর পরকালীন জীবনে যে

মূল্য আদায় করার ওয়াদা তার পক্ষ থেকে করা হয়েছে তার বিনিময়ে নিজের আজকের স্বাধীনতা ও তার যাবতীয় স্বাদ বিক্রি করতে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে রাজী হয়ে যাবার মত আস্থা তার প্রতি আছে কিনা।
দুইঃ যে ফিকাহর আইনের ভিত্তিতে দুনিয়ার ইসলামী সমাজ গঠিত হয় তার দৃষ্টিতে ঈমান শুধুমাত্র কতিপয় বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। এ স্বীকৃতির পর নিজের স্বীকৃতি ও অংগীকারের ক্ষেত্রে মিথ্যুক হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শরীয়াতের কোন বিচারক কাউকে অমুমিন বা ইসলামী মিল্লাত বহির্ভুত ঘোষণা করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য ঈমানের তাৎপর্য ও স্বরূপ হচ্ছে, বান্দা তার চিন্তা ও কর্ম উভয়ের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ক্ষমতা আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দিবে এবং নিজের মালিকানার দাবী পুরোপুরি তার সপক্ষে প্রত্যাহার করবে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের কালেমার স্বীকৃতি দেয় এবং নামায-রোযা ইত্যাদির বিধানও মেনে চলে, কিন্তু নিজেকে নিজের দেহ ও প্রাণের নিজের মন, মস্তিস্ক ও শারীরিক শক্তির নিজের ধন-সম্পদ, উপায়, উপকরণ ইত্যাদির এবং নিজের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত জিনিসের মালিক মনে করে এবং সেগুলোকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার স্বাধীনতা নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখে, তাহলে হয়তো দুনিয়ায় তাকে মুমিন মনে করা হবে কিন্তু আল্লাহর কাছে সে অবশ্যী অমুমিন হিসেবে গণ্য হবে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে কেনা-বেচার ব্যাপারে ইমানের আসল তাৎপর্য ও স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সে আল্লাহর সাথে আদতে কোন কেনা-বেচার কাজই করেননি। যেখানে আল্লাহ চান সেখানে ধন প্রাণ নিয়োগ না করা এবং যেখানে তিনি চান না সেখানে ধন প্রাণ নিয়োগ ও ব্যবহার করা - এ দুটি কার্যধারাই চূড়ান্তভাবে ফায়সালা করে দেয় যে, ইমানের দাবীদার ব্যক্তি তার ধন প্রাণ আল্লাহর হাতে বিক্রি করেইনি অথবা বিক্রির চুক্তি করার পরও সে বিক্রি করা জিনিসকে যথারীতি নিজের মনে করেছে।
তিনঃ ঈমানের এ তাৎপর্য ও স্বরূপ ইসলামী জীবনাচরণকে কাফেরী জীবনাচরণ থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে মুসলিম ব্যক্তি সঠিক অর্থে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে সে জীবনের সকল বিভাগে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করে। তার আচরণে কোথাও স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভংগীর প্রকাশ ঘটতে পারে না। তবে কোন সময় সাময়িকভাবে সে গাফলতির শিকার হতে পারে এবং আল্লাহর সাথে নিজের কেনা-বেচার চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা অবলম্বন করাও তার পক্ষে সম্ভব। এটা অবশ্যি ভিন্ন ব্যাপার। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের সমন্বায়ে গঠিত কোন দল বা সমাজ সমষ্টিগতভাবেও আল্লাহর ইচ্ছা ও তার শরয়ী আইনের বিধিনিষেধমুক্ত হয়ে কোন নীতি পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় নীতি, তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতিএবং কোন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক আচরণ অবলম্বন করতে পারে না। কোন সাময়িক গাফলতির কারণে যদি সেটা অবলম্বন করেও থাকে তাহলে যখনই সে এ ব্যাপারে জানতে পারবে তখনই স্বাধীন ও স্বৈরাচারী আচরণ ত্যাগ করে পুনরায় বন্দেগীর আচরণ করতে থাকবে। আল্লাহর আনুগত্য মুক্ত হয়ে কাজ করা এবং নিজের ও নিজের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে নিজে নিজেই কি করবো না করবো, সিদ্ধান্ত নেয়া অবশ্যি একটি

কুফরী জীবনাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের জীবন যাপন পদ্ধতি এ রকম তারা মুসলমান নামে আখ্যায়িত হোক বা অমুসলিম নামে তাতে কিছু যায় আসে না।

চারঃ এ কেনা-বেচার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর যে ইচ্ছার আনুগত্য মানুষের জণ্য অপরিহার্য হয় তা মানুষের নিজের প্রস্তাবিত বা উদ্ভাবিত নয় বরং আল্লাহ নিজে যেমন ব্যক্ত করেন তেমন। নিজে নিজেই কোন জিনিসকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে ধরে নেয়া এবং তার আনুগত্য করতে থাকা মূলত আল্লাহর ইচ্ছা নয় বরং নিজেরই ইচ্ছার আনুগত্য করার শামিল। এটি এ কেনাবেচার চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। যে ব্যক্তি ও দল আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর হেদায়াত থেকে নিজের সমগ্র জীবনের কর্মসুচী গ্রহণ করেছে একমাত্র তাকেই আল্লাহর সাথে কৃত নিজের কেনা-বেচার চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হবে।

এ হচ্ছে এ কেনা-বেচার অন্তর্নিহিত বিষয়। এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর এ কেনা-বেচার ক্ষেত্রে বর্তমান পার্থিব জীবনের অবসানের পর মূল্য (অর্থাৎ জান্নাত।) দেবার কথা বলা হয়েছে কেন তাও আপনা আপনিই বুঝে আসে। বিক্রেতা নিজের প্রাণ ও ধন -সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেবে কেবলমাত্র এ অংগীকারের বিনিময়েই যে জান্নাত পাওয়া যাবে তা নয়। বরং বিক্রেতা নিজের পার্থিব জীবনে এ বিক্রি করা জিনিসের ওপর নিজের স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রত্যাহার করবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত আমানতের রক্ষক হয়ে তার ইচ্ছা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করবে। এরূপ বাস্তব ও সক্রিয় তৎপরতার বিনিময়েই জান্নাত প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং বিক্রেতার পার্থিব জীবনকাল ও শেষ হবার পর যখন প্রমাণিত হবে যে, কেনা-বেচার চুক্তি করার পর সে নিজের পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চুক্তির শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলেছে একমাত্র তখনই এ বিক্রি সম্পূর্ণ হবে। এর আগে পর্যন্ত ইনসাফের দৃষ্টিতে সে মূল্য পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

এ বিষয়গুলো পরিষ্কার ভাবে বুঝে নেবার সাথে সাথে এ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় কোন প্রেক্ষাপটে এ বিষয়বস্তুটির অবতারণা হয়েছে তাও জেনে নেয়া উচিত। ওপর থেকে যে ধারাবাহিক ভাষণ চলে আসছিল তাতে এমন সব লোকের কথা ছিল যারা ঈমান আনার অংগীকার করেছিল ঠিকই কিন্তু পরীক্ষার কঠিন সময় সমুপস্থিত হলে তাদের অনেকে গাফলতির কারণে, অনেকে আন্তরিকতার অভাবে এবং অনেকে চূড়ান্ত মুনাফিকীর পথ অবলম্বন করার ফলে আল্লাহর ও তার দীনের জন্য নিজের সময় ধন সম্পদ স্বার্থ ও প্রাণ দিতে ইতস্তত করেছিল। কাজেই এ বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেনীর আচরণের সমালোচনা করার পর এখন তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়া হচ্ছে, তোমরা যে ঈমান গ্রহণ করার অংগীকার করেছো তা নিছক আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব মেনে নেবার নাম নয়। বরং একমাত্র আল্লাহই যে তোমাদের জান ও তোমাদের ধন-সম্পদের মালিক ও অকাট্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব মেনে নেয়া ও এর স্বীকৃতি দেয়ার নামই ঈমান। কাজেই এ অংগীকার করার পর যদি তোমরা এ প্রাণ ও ধন-সম্পদ আল্লাহর হুকুমে কুরবানী করতে ইতস্তত করো এবং অন্যদিকে নিজের দৈহিক ও আত্মিক শক্তিসমূহ এবং নিজের উপায়-উপকরণ সমূহ আল্লাহর

ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকো তাহলে এ থেকে একথাই প্রমাণিত হবে যে, তোমাদের অংগীকার মিথ্যা। সাচ্চা ঈমানদার একামাত্র তারাই যারা যথার্থই নিজেদের জান-মাল আল্লাহর হাতে বিকিয়ে দিয়েছে এবং তাকেই এ সবের মালিক মনে করেছে। তিনি এগুলো যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেন সেখানে নির্দ্বিধায় এগুলো ব্যয় করে এবং যেখানে তিনি নিষেধ করেন সেখানে দেহ ও আত্মার সামান্যতম শক্তিও এবং আর্থিক উপকরণের নগন্যতম অংশও ব্যয় করতে রাজী হয় না।

এ ব্যাপারে অনেকগুলো আপত্তি তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, এখানে যে ওয়াদার কথা বলা হয়েছে তা তাওরাত ও ইনজীলে নেই। কিন্তু ইনজীলের ব্যাপারে এ ধরনের কথা বলার কোন ভিত্তি নেই। বর্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যে ইনজীলসমূহ পাওয়া যায় সেগুলোর হযরত ঈসা (আ) এর এমন অনেকগুলো উক্তি পাওয়া যায় যেগুলো এ আয়াতের সমর্থক। যেমনঃ

ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বার্গরাজ্য তাহাদেরই। (মথি ৫:১০)

যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারাইবে, এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে। (মথি ১০:৩৯)

আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী কি ভ্রাতা, কি ভাগীনি কি পিতা ও মাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। (মথি ১৯:২৯)

তবে তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তাতে অবশ্যি এ বিষয়বস্তুটি পাওয়া যায় না। শুধু এটি কেন, সেখানে তো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, শেষ বিচারের দিন ও পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির ধারণাই অনুপস্থিত। অথচ এ আকীদা সবসময় আল্লাহর সত্য দীনের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবেই বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বর্তমান তাওরাতে এ বিষয়টির অস্তিত্ব না থাকার ফলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহন করাও ঠিক নয় যে, যথার্থই তাওরাতের এ অস্তিত্ব ছিল না।আসলে ইহুদীরা তাদের অবনতির যুগে এতই বস্তুবাদী ও দুনিয়াবী সমৃদ্ধির মোহে এমন পাগল হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের কাছে নিয়ামত ও পুরস্কার এ দুনিয়ায় লাভ করা ছাড়া তার আর কোন অর্থই ছিলো না। এ কারণে আল্লাহর কিতাবে বন্দেগী ও আনুগত্যের বিনিময়ে তাদেরকে যেসব পুরস্কার দেবার ওয়াদা করা হয়েছিল সে সবকে তারা দুনিয়ার এ মাটিতেই নামিয়ে এনেছিল এবং জান্নাতের প্রতিটি সংজ্ঞা ও বৈশিষ্টকে তারা তাদের আকাংখিত ফিলিস্তিনের ওপর প্রয়োগ করেছিল । তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে আমরা এ ধরনের বিষয়বস্তু দেখতে পাই। যেমনঃ

হে ইস্রায়েল শুন, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভূ একই সদাপ্রভু, তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভূকে প্রেম করিবে। (দ্বীতীয় বিবরণ ৬: ৪, ৫)

আরো দেখিঃ

তিনি কি তোমার পিতা নহেন, যিনি তোমাকে লাভ করিলেন। তিনিই তোমার নির্মাতা ও স্থিতিকর্তা। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৬)

কিন্তু আল্লাহর সাথে এ সম্পর্কের যে পুরস্কার বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তোমরা এমন একটি দেশের মালিক হয়ে যাবে যেখানে দুধ ও মধুর নহর প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ ফিলিস্তিন। এর আসল কারণ হচ্ছে, তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তা প্রথমত সম্পূর্ণ নয়, তাছাড়া নির্ভেজাল আল্লাহর বাণী সম্বলিত ও নয়। বরং তার মধ্যে আল্লাহর বানীর সাথে অনেক ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য ও সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে ইহুদীদের জাতীয় ঐতিহ্য, বংশপ্রীতি, কুসংস্কার আশা-আকাংখা ভুল ধারণাও ফিকাহভিত্তিক ইজতিহাদের একটি বিরাট অংশ একই ভাষণ ও বানী পরম্পরার মধ্যে এমন ভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে যে, অধিকাংশ স্থানে আল্লাহর আসল কালামকে তার মধ্যে থেকে পৃথক করে বের করে নিয়ে আসা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১১৫

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ১২০

মাদীনার অধিবাসী এবং তাদের আশেপাশে যে সব পল্লী রয়েছে তাদের পক্ষে এটা উচিত ছিলনা যে, তারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী না হয়; আর এটাও (উচিত ছিল) না যে, নিজেদের প্রাণ তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মনে করে। এর কারণ এই যে, আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি আর ক্ষুধা পায় এবং তাদের এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় কাফিরদের যে ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে, আর দুশমনদের হতে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় - এর প্রত্যেকটি সৎ কাজ বলে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মশীল লোকদের শ্রমফল (সাওয়াব) বিনষ্ট করেননা।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১১৬

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ১২২

আর মু'মিনদের এটাও সমীচীন নয় যে, **(জিহাদের জন্য) সবাই একত্রে বের হয়ে পড়ে; সুতরাং এমন কেন করা হয়না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বহির্গত হয়,** যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কাওমকে (নাফরমানী হতে) ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা তাদের

নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা পরহেয করে চলতে পারে (যাতে তারা অসদাচরণ থেকে বিরত হয়)।

তাফসীর বলে

আয়াতের অর্থ অনুধাবন করার জন্য এ সূরার ৯৭ আয়াতটি সামনে রাখতে হবে। তাতে বলা হয়েছেঃ "মরুচারী আরবরা কূফরী ও মুনাফিকীতে অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং আল্লাহ তার রসূলের প্রতি যে দীন নাযিল করেছেন তা সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ হওয়ার সম্ভবনা অপেক্ষাকৃত বেশী"।

সেখানে শুধু এতটুকু বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, দারুল ইসলামের গ্রামীণ এলাকার বেশীরভাগ জনবসতি মুনাফিকী রোগে আক্রান্ত। কারণ এসব লোক অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে। জ্ঞানের কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ না থাকা এবং জ্ঞনবানদের সাহচর্যে না পাওয়ার ফলে এরা আল্লাহর দীনের সীমারেখা জানে না। আর এখানে বলা হচ্ছে, গ্রামীণ জনবসতিকে এ অবস্থায় থাকতে দেয়া যাবে না। বরং তাদের অজ্ঞতা দূর এবং তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করার জন্য এখন যথাযথ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এ জন্য গ্রামীণ এলাকার সমস্ত আরব অধিবাসীদের নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে মদীনায় জামায়েত হবার এবং এখানে বসে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন নেই। বরং এ জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, প্রত্যেক গ্রাম, পল্লী ও গোত্র থেকে কয়েকজন করে লোক বের হবে। তারা জ্ঞানের কেন্দ্রগুলো যেমন মদীনা ও মক্কা এবং এ ধরনের অন্যান্য জায়গায় আসবে । এখানে এসে তারা দীনের জ্ঞান আহরণ করবে। এখান থেকে তারা নিজেদের জনবসতিতে ফিরে যাবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দীনী চেতনা ও জাগরণ সৃষ্টিতে তৎপর হবে।

এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। ইসলামী আন্দোলনকে শক্তিশালী ও মজবুত করার জন্য সঠিক সময়ে এ নির্দেশটি দেয়া হয়েছিল। শুরুতে ইসলাম যখন আরবে ছিল একেবারেই নতুন এবং একটি চরম প্রতিকূল পরিবেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল তখন এ ধরনের নির্দেশের প্রয়োজন ছিল না। কারণ তখন যে ব্যক্তি ইসলাম কে পুরোপুরি বুঝে নিতো এবং সব দিকে দিয়ে তাকে যাচাই করে নিশ্চিত হতে পারতো একমাত্র সে ই ইসলাম গ্রহণ করতে। কিন্তু যখন এ আন্দোলন সাফল্যের পর্যায়ে প্রবেশ করলো এবংপৃথিবীতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো এবং এলাকার পর এলাকা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকলো। এ সময় খুব কম লোকই ইসলামের যাবতীয় চাহিদাও দাবী অনুধাবন কররে ভালভাবে জেনে বুঝে ইসলাম গ্রহণ করতো। বেশীর ভাগ লোকই নিছক অচেতনভাবে,সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে আসছিল। নতুন মুসলিম জনবসতির এ দ্রুত বিস্তার বাহ্যত ইসলামের শক্তিমত্তার কারণ ছিল। কেননা ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বেড়ে চলছিল। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের জনবসতি ইসলামী ব্যবস্থার কোন কাজে লাগেছিল না বরং তার জন্য ক্ষতিকর ছিল। কারণ তাদের ইসলামী চেতনা ছিল না এবং এ ব্যবস্থার

নৈতিক দাবী পূরণ করতেও তারা প্রস্তুত ছিল না।বস্তুত তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় এ ক্ষতি সুস্পষ্ট আকারে সামনে এসে গিয়েছিল। তাই সঠিক সময়ে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, ইসলামী আন্দোলনের বিস্তৃতির কাজ যে গতিতে চলছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাকে শক্তিশালী ও মজবুত করার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সে ব্যবস্থাটি হচ্ছে, প্রত্যেক এলাকার লোকদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নিয়ে শিক্ষা ও অনুশীলন দান করতে হবে, তারপর তারা প্রত্যেকে নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও অনুশীলনের দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে সমগ্র মুসলিম জনবসতিতে ইসলামের চেতনা ও আল্লাহর বিধানের সীমারেখা সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে পড়বে।

এ প্রসংগে এতটুকু কথা অবশ্যি অনুধাবন করতে হবে যে, এ আয়াতে যে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করার হুকুম দেয়া হয়েছে তার আসল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে নিছক সাক্ষরতা সম্পন্ন করা এবং এদের মধ্যে বইপত্র পড়ার মতো যোগ্যতা সৃষ্টি করা ছিল না। বরং লোকদের মধ্যে দীনের বোধ ও জ্ঞান সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে অমুসলিম সুলভ জীবনধারা থেকে রক্ষা করা, সতর্ক ও সজ্ঞান করে তোলা এর আসল উদ্দেশ্য হিসেবে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। এটিই মুসলমানদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ নিজেই চিরকালের জন্য এ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করতে হবে। দেখতে হবে এ উদ্দেশ্য সে কতটুকু পূরণ করতে সক্ষম। এর অর্থ এ নয় যে, ইসলাম লোকদেরকে লেখা-পড়া শেখাতে, বই পড়তে সক্ষম করতে তুলতে ও পার্থিব জ্ঞান দান করতে চায় না।বরং এর অর্থ হচ্ছে, ইসলাম লোকদের মধ্যে এমন শিক্ষা বিস্তার করতে চায় যা ওপরে বর্ণিত শিক্ষালাভের জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত আসল উদ্দেশ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নয়তো প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার যুগের আইনষ্টাইন ও ফ্রয়েড হয়ে যায় কিন্তু দীনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা শূন্যের কোঠায় অবস্থান করে এবং অমুসলিম সূলভ জীবনধারায় বিভ্রান্ত হতে থাকে তাহলে ইসলাম এ ধরনের শিক্ষার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।

এ আয়াতে উল্লেখিত --------(লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ্দীন) বাক্যাংশটির ফলে পরবর্তীকালে লোকদের মধ্যে আশ্চর্য ধরনের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা বরং তাদের ধর্মীয় জীবনধারার ওপর এর বিষয়ময় প্রভাব দীর্ঘকাল থেকে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। আল্লাহ "তাফাক্কুহ্ ফিদ্ দীন" কে শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিণত করেছিলেন। এর অর্থ হচ্ছেঃ দীন অনুধাবন করা বা বুঝা, দীনের ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা, তার প্রকৃতি ও প্রাণশক্তির সাথে পরিচিত হওয়া এবং এমন যোগ্যতার অধিকারী হওয়া যার ফলে চিন্তা ও কর্মের সকল দিক ও জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে কোন চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি ইসলামের প্রাণশক্তির অনুসারী ত মানুষ জানতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে যে আইন সম্পর্কিত জ্ঞান পারিভাষিক অর্থে ফিকহ নামে পরিচিত হয় এবং যা ধীরে ধীরে ইসলামী জীবনের নিছক বাহ্যিক কাঠামোর (প্রাণশক্তির মোকাবিলায়) বিস্তারিত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, লোকেরা শাব্দিক অভিন্নতার কারণে তাকেই আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষার চরম ও পরম

লক্ষ মনে করে বসেছে। অথচ সেটিই সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ নয়। বরং তা ছিল উদ্দেশ্য ও লক্ষের একটি অংশ মাত্র। এ বিরাট ভুল ধারণার ফলে দীন ও তার অনুসারীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করতে হলে একটি বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আমরা এ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্য সংক্ষেপে শুধুমাত্র এতটুকু ইংগিত করছি যে, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাকে যে জিনিসটি দীনী প্রাণশক্তি বিহীন করে নিছক দীনী কাঠামো ও দীনী আকৃতির ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং অবশেষে যার বদৌলতে মুসলমানদের জীবনে একটি নিছক প্রাণহীন বাহ্যিকতা দীনদারীর শেষ মনযিলে পরিণত হয়েছে তা বহুলাংশে এ ভুল ধারণারই ফল।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১১৭

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ১২৩

হে মু'মিনগণ! **ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়;** আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ পরহেযগারদের সাথে রয়েছেন।

তাফসীর বলে

মূল আয়াতে যে শব্দ সংযোজিত হয়েছে তার বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, দারুল ইসলামের যে অংশ ইসলামের শত্রুদের এলাকার যে অংশের সাথে মিশে আছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রাথমিক দায়িত্ব ঐ অংশের মুসলমানদের ওপর আরোপিত। কিন্তু পরে যা বলা হয়েছে তার সাথে - এ আয়াতটিকে মিলিয়ে পড়লে জানা যাবে, এখানে কাফের বলতে এমন সব মুনফিককে বুঝানো হয়েছে যাদের সত্য অস্বীকার করার বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে গিয়েছিল। এবং যাদের ইসলামী সামজের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে থাকার কারণে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছিল। ১০ রুকূর শুরুতেও এ ভাষণটি আরম্ভ করার সময় প্রথম কথার সূচনা এভাবেই করা হয়েছিলঃ **এবার এ ঘরের শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য যথারীতি জিহাদ শুরু করে দিতে হবে।** এখানে ভাষণ শেষ করার সময় তাকীদ সহকারে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করবে। যে আত্মীয়তা এবং বংশগত ও সামাজিক সম্পর্কের কারণে তারা মুনাফিকদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে ছিল এরপর আর তারা তাদের সাথে ঐ সম্পর্কের পরোয়া করবে না। **সেখানে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। আর এখানে তার চেয়ে কড়া "কিতাল" শব্দ (সশস্ত্র যুদ্ধ করে হত্যা করা) ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, তাদেরকে পুরোপুরি উৎখাত করে দও, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না থাকে।** সেখানে কাফের ও মুনাফিক দুটো আলাদা শব্দ বলা হয়েছিল। আর এখানে শুধুমাত্র কাফের

শব্দের ওপরই নির্ভর করা হয়েছে। কারণ তাদের সত্য অস্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। কাজেই ঈমানের বাহ্যিক স্বীকৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করে তা যে কোন প্রকার সুবিধা আদায় করতে না পারে একথাটি ব্যক্ত করাই এর উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ এ পর্যন্ত তাদের সাথে যে নরম ব্যবহার করা হয়েছে তার এখন পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। দশ রুকূর শুরুতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ---------তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করো।

এ সতর্ক বাণীর দুটি অর্থ হয়। দুটো অর্থই এখানে সমানভাবে প্রযোজ্য। এক, এ সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে যদি তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরোয়া করো তাহলে এটা হবে তাকওয়া বিরোধী। কারণ মুত্তাকী হওয়া এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে মানসিক সম্পর্ক রাখা- এ দুটো বিষয় পরস্পর বিরোধী। কাজেই আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে এ ধরনের সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে হবে। দুই, এ কঠোরতা ও যুদ্ধ করার যে হুকুম দেয়া হচ্ছে, এর অর্থ এ নয় যে, তাদের প্রতি কঠোর হবার ব্যাপারে নৈতিকতা ও মানবিকতার সমস্ত সীমারেখা ভেংগে ফেলতে হবে। সমস্ত কাজে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা অটুট রাখার দায়িত্ব অবশ্যি মানুষের ওপর বর্তায়। মানুষ যদি তা পরিত্যাগ করে তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহও তাকে পরিত্যাগ করবে।

অধ্যায়-০৭: সূরা আন নাহল (১৬) (মৌমাছি)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১১৮

সূরা আন নাহল (১৬) আয়াত ১১০

অবশ্যই তোমার প্রতিপালক তাদের জন্য যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরাত করে, অতঃপর জিহাদ করে, অতঃপর ধৈর্যধারণ করে, এ সবের পর তোমার প্রতিপালক অবশ্যই বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।

তাফসীর বলে

এখানে হাবশার (ইথিয়োপিয়া) মুহাজিরদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

অধ্যায়-০৮: সূরা আল হাজ্জ্ব (২২) (হজ্জ)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১১৯

সূরা আল হাজ্জ্ব (২২) আয়াত ৩৯

যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।

তাফসীর বলে

যেমন ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলা হয়েছে, **আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা সম্পর্কে অবতীর্ণ এটিই প্রথম আয়াত।** এ আয়াতে কেবলমাত্র অনুমতি দেয়া হয়েছিল। **পরে সূরা বাকারায় যুদ্ধের আদেশ প্রদান সম্পর্কিত আয়াতটি নাযিল হয়।** অর্থাৎ

অনুমতি ও হুকুম দেয়ার মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী অনুমতি নাযিল হয় হিজরীর প্রথম বছরের যিলহজ্জ মাসে এবং হুকুম নাযিল হয় বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে।

অর্থাৎ এরা মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক, এ সত্ত্বেও আল্লাহ এদেরকে আরবের সমগ্র মুশরিক সমাজের ওপর বিজয়ী করতে পারেন। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যখন এ অস্ত্রধারণ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছিল তখন মুসলমানদের সমস্ত শক্তি কেবলমাত্র মদীনার একটি মামূলী ছোট শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময় মুহাজির ও আনসারদের মিলিত শক্তি সর্বসাকুল্যে এক হাজারও ছিল না। এ অবস্থায় কুরাইশদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছিল। আর কুরাইশরা একা ছিল না বরং আরবের অন্যান্য মুশরিক গোত্রগুলোও তাদের পেছনে ছিল। পরে ইহুদীরাও তাদের সাথে যোগ দেয়। এসময় "আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে" একথা বলা অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। এর ফলে এমনসব মুসলমানদের মনেও সাহসের সঞ্চার হয়েছে যাদেরকে সমগ্র আরব শক্তির বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে মোকাবিলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং কাফেরদেরকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই মর্মে যে, তোমাদের মোকবিলা আসলে আল্লাহর সাথে, ঐ মুষ্টিমেয় মুসলমানদের সাথে নয়। কাজেই যদি আল্লাহর মোকাবিলা করার সাহস থাকে তহলে সামনে এসো।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১২০

সূরা আল হাজ্জ্ব (২২) আয়াত ৫৮

আর যারা হিজরাত করেছে, **আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যু বরণ করেছে,** তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; এবং আল্লাহ তিনিইতো সর্বোৎকৃষ্ট রিযকদাতা।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১২১

সূরা আল হাজ্জ্ব (২২) আয়াত ৭৮

আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন। দ্বীনের ভিতর তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেননি। এটাই তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন, আল্লাহ তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বেও, আর এ কিতাবেও (ঐ নামই দেয়া হয়েছে) যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। কাজেই তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও আর আল্লাহকে আঁকড়ে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কতই না উত্তম অভিভাবক আর কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

তাফসীর বলে

জিহাদ মানে নিছক রক্তপাত বা যুদ্ধ নয় বরং এ শব্দটি প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব এবং চূড়ান্ত চেষ্টা চালানো অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার জিহাদ ও মুজাহিদের মধ্যে এ অর্থও রয়েছে যে, বাধা দেবার মতো কিছু শক্তি আছে যেগুলোর মোকাবিলায় এই প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম কাম্য। এই সংগে "ফিল্লাহ" (আল্লাহর পথে) শব্দ এ বিষয়টি নির্ধারিত করে দেয় যে, বাধাদানকারী শক্তিগুলো হচ্ছে এমনসব শক্তি যেগুলো আল্লাহর বন্দেগী, তার সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর পথে চলার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের উদ্দেশ্য হয় তাদের বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিহত করে মানুষ নিজেও আল্লাহর যথাযথ বন্দেগী করবে এবং দুনিয়াতেও তাঁর কালেমাকে বুলন্দ এবং কুফর ও নাস্তিক্যবাদের কালেমাকে নিম্নগামী করার জন্য প্রাণপাত করবে। মানুষের নিজের "নফসে আম্মারা" তথা বৈষয়িক ভোগলিপ্সু ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে এ মুজাহাদা ও প্রচেষ্টা প্রথম অভিযান পরিচালিত হয়। এ নফসে আম্মারাই সব সময় আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে এবং মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে সরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা

চালায়। তাকে নিয়ন্ত্রিত ও বিজিত না করা পর্যন্ত বাইরে কোন প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের সম্ভাবনা নেই। তাই এক যুদ্ধ ফেরত গাজীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে এসে গেছো। " আরো বলেন, "মানুষের নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম।" এরপর সারা দুনিয়াই হচ্ছে জিহাদের ব্যাপকতর ক্ষেত্র। সেখানে কর্মরত সকল প্রকার বিদ্রোহাত্মক, বিদ্রোহদ্দীপক ও বিদ্রোহোৎপাদক শক্তির বিরুদ্ধে মন, মস্তিষ্ক, শরীর ও সম্পদের সমগ্র শক্তি সহকারে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানোই হচ্ছে জিহাদের হক আদায় করা, যার দাবী এখানে করা হচ্ছে। অর্থাৎ উপরে যে খিদমতের কথা বলা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির মধ্য থেকে তোমাদেরকে তা সম্পাদন করার জন্য বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারায় বলা হয়েছেঃ (১৪৩ আয়াত) এবং সরা আলে ইমরানে বলা হয়েছেঃ (১১০ আয়াত) এখানে একথাটিও জানিয়ে দেয়া সংগত মনে করি যে, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা যেসব আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং যেসব আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও দোষারোপকারীদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় এ আয়াতটি সেগুলোর অন্তরভুক্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, এ আয়াতে সরাসরি সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্যলোকদের প্রতি সম্বোধন মূলত তাঁদেরই মাধ্যমে করা হয়েছে।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের ফকীহ, ফরিশী ও পাদরীরা তাদের ওপর যেসব অপ্রয়োজনীয় ও অযথা নীতি-নিয়ম চাপিয়ে দিয়েছিল সেগুলো থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এখানে চিন্তা-গবেষণার ওপর এমন কোন বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়নি যা তাত্ত্বিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। আবার বাস্তবে কর্মজীবনেও এমন বিধি নিষেধের পাহাড় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়নি যা সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়। তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে একটি সহজ সরল বিশ্বাস ও আইন। এ নিয়ে তোমরা যতদূর এগিয়ে যেতে চাও এগিয়ে যেতে পারো। এখানে যে বিষয়বস্তুটিকে ইতিবাচক ভংগীতে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি আবার অন্যত্র উপস্থাপিত হয়েছে নেতিবাচক ভংগীতে। যেমন-

"এ রসূল তাদেরকে পরিচিত সৎকাজের হুকুম দেয় এবং এমন সব অসৎ কাজ করতে তাদেরকে নিষেধ করেন যেগুলো করতে মানবিক প্রকৃতি অস্বীকার করে আর এমন সব জিনিস তাদের জন্য হালাল করে যেগুলো পাক পবিত্র এবং এমন সব জিনিস হারাম করে যেগুলো নাপাক ও অপবিত্র আর তাদের ওপর থেকে এমন ভারী বোঝা নামিয়ে দেয়, যা তাদের ওপর চাপানো ছিল এবং এমন সব শৃংখল থেকে তাদেরকে মুক্ত করে যেগুলোয় তারা আটকে ছিল।" (আ'রাফঃ১৫৭)

যদিও ইসলামকে ইবরাহীমের মিল্লাতের ন্যায় নূহের মিল্লাত, মূসার মিল্লাত ও ঈসার মিল্লাত বলা যেতে পারে কিন্তু কুরআন মজীদে বার বার একে ইবরাহীমের মিল্লাত বলে তিনটি কারণে এর অনুসরণ করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এক কুরআনের বক্তব্যের প্রথম লক্ষ ছিল আরবরা, আর তারা ইবরাহীমের সাথে যেভাবে পরিচিত ছিল তেমনটি আর কারো সাথে ছিল না। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আকীদা-বিশ্বাস যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সর্বব্যাপী ছিল তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। দুই, হযরত

ইবরাহীমই এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁর উন্নত চরিত্রের ব্যাপারে ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান, আরবীয় মুশরিক ও মধ্যপ্রাচ্যের সাবেয়ী তথা নক্ষত্রপূজারীরা সবাই একমত ছিল। নবীদের মধ্যে দ্বিতীয় এমন কেউ ছিলেন না এবং নেই যার ব্যাপারে সবাই একমত হতে পারে। তিন, হযরত ইবরাহীম এসব মিল্লাতের জন্মের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন। ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ ও সাবেয়বাদ সম্পর্কে তো সবই জানে যে, এগুলো পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হয়েছে আর আরবীয় মুশরিকদের ব্যাপারে বলা যায়। তারা নিজেরাও একথা স্বীকার করতো যে, তাদের সমাজে মূর্তি পূজা শুরু হয় আমর ইবনে লুহাই থেকে। সে ছিল বনী খুযা'আর সরদার। মাআব (মাওয়াব) এলাকা থেকে সে 'হুবুল' নামক মূর্তি নিয়ে এসেছিল। তার সময়টা ছিল বড় জোর ঈসা আলাইহিস সালামের পাঁচ-ছ'শ' বছর আগের। কাজেই এ মিল্লাতটিও হযরত ইবরাহীমের শত শত বছর পরে তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় কুরআন যখন বলে এ মিল্লাতগুলো পরিবর্তে ইবরাহীমের মিল্লাত গ্রহণ করো তখন সে আসলে এ সত্যটি জানিয়ে দেয় যে, যদি হযরত ইবরাহীম সত্য ও হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকেন এবং এ মিল্লাতগুলোর মধ্য থেকে কোনটিরই অনুসারী না থেকে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই তাঁর মিল্লাতই প্রকৃত সত্য মিল্লাত। পরবর্তীকালের মিল্লাতগুলো সত্য নয়। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মিল্লাতের দিকেই দাওয়াত দিচ্ছেন। "তোমাদের" সম্বোধনটি শুধুমাত্র এ আয়াতটি নাযিল হবার সময় যেসব লোক ঈমান এনেছিল অথবা তারপর ঈমানদারদের দলভুক্ত হয়েছিল তাদের উদ্দেশে করা হয়নি বরং মানব ইতিহাসের সূচনা লগ্ন থেকেই যারা তাওহীদ, আখেরাত, রিসালাত ও আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী দলভুক্ত থেকেছে তাদের সবাইকেই এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, এ সত্য মিল্লাতের অনুসারীদেরকে কোনদিন "নূহী" "ইবরাহিমী", "মুসাবী" ইত্যাদি বলা হয়নি বরং তাদের নাম "মুসলিম (আল্লাহর ফরমানের অনুগত) ছিল এবং আজো তারা "মুহাম্মাদী" নয় বরং মুসলিম। একথাটি না বুঝার কারণে লোকদের জন্য এ প্রশ্নটি একটি ধাঁধার সৃষ্টি করে রেখেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাবে মুসলিম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

অথবা অন্য কথায় মজবুতভাবে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরো। পথ নির্দেশনা ও জীবন যাপনের বিধান তাঁর কাছ থেকেই নাও। তাঁরই আনুগত্য করো। তাঁকেই ভয় করো। আশা-আকাংখা তাঁরই সাথে বিজড়িত করো। সাহায্যের জন্য তাঁরই কাছে হাত পাতো। তাঁরই সত্তার ওপর নির্ভর করে তাওয়াক্কুল ও আস্থার বুনিয়াদ গড়ে তোলো।

অধ্যায়-০৯: সূরা আন নূর (২৪) (আলো)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১২২

সূরা আন নূর (২৪) আয়াত ৫৩

(হে নবী!) তারা শক্ত করে কসম খেয়ে বলে যে, **তুমি তাদেরকে আদেশ করলে তারা অবশ্য অবশ্যই বের হবে,** বল: তোমরা কসম খেয়ো না, **স্বাভাবিক আনুগত্যই কাম্য,** বস্তুতঃ তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

তাফসীর বলে

দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে, মু'মিনদের থেকে কাংখিত আনুগত্য হচ্ছে এমন পরিচিত ধরনের আনুগত্য যা সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধে থাকে তা এমন ধরনের আনুগত্য নয় যার নিশ্চয়তা দেবার জন্য কসম খাবার প্রয়োজন হয় এবং এর পরও তার প্রতি অবিশ্বাস থাকে। যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আদেশের অনুগত হয় তাদের মনোভাব ও কর্মনীতি গোপন থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কার্যধারা দেখে অনুভব করে, এরা আনুগত্যশীল লোক। তাদের ব্যাপারে এমন কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশই নেই যে, তা দূর করার জন্য কসম খাবার প্রয়োজন দেখা দেবে।

অর্থাৎ সৃষ্টির মোকাবিলায় এ প্রতারণা হয়তো সফল হয়ে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহর মোকাবিলায় কেমন করে সফল হতে পারে। তিনি তো প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থা বরং মনের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা, চিন্তা ও আশা-আকাংখাও জানেন।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১২৩

সূরা আন নূর (২৪) আয়াত ৫৫

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে **আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফাত দান করবেন** যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে তিনি খিলাফাত দান করেছিলেন এবং তিনি তাদের দ্বীনকে অবশ্যই

কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে পরিবর্তিত করে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ‘ইবাদাত করবে, কোন কিছুকে আমার শরীক করবে না। এরপরও যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে তারাই বিদ্রোহী, অন্যায়কারী।

তাফসীর বলে

এ বক্তব্যের শুরুতেই আমি ইংগিত করেছি, এ উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফিকদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা যে, আল্লাহ মুসলমানদের খিলাফত দান করার যে, প্রতিশ্রুতি দেন তা নিছক আদম শুমারীর খাতায় যাদের নাম মুসলমান হিসেবে লেখা হয়েছে তাদের জন্য নয় বরং এমন মুসলমানদের জন্য যারা সাচ্ছা ঈমানদার, চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে সৎ, আল্লাহর পছন্দনীয় দীনের আনুগত্যকারী এবং সব ধরনের শিরক মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বকারী। যাদের মধ্যে এসব গুণ নেই, নিছক মুখে ঈমানের দাবীদার, তারা এ প্রতিশ্রুতিলাভের যোগ্য নয় এবং তাদের জন্য এ প্রতিশ্রুতি দানও করা হয়নি। কাজেই তারা যেন এর অংশীদার হবার আশা না রাখে।

কেউ কেউ খিলাফতকে নিছক রাষ্ট্র ক্ষমতা, রাজ্য শাসন, প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অর্থে গ্রহণ করেন। তারপর আলোচ্য আয়াত থেকে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, দুনিয়ায় যে ব্যক্তিই এ শক্তি অর্জন করে সে মু'মিন, সৎ, আল্লাহর পছন্দনীয় দীনের অনুসারী, আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বকারী এবং শিরক থেকে দূরে অবস্থানকারী। এরপর তারা নিজেদের এ ভুল সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য ঈমান, সৎকর্মশীলতা, সত্যদীন, আল্লাহর ইবাদাত ও শির্‌ক তথা প্রত্যেকটি জিনিসের অর্থ বিকৃত করে তাকে এমন কিছু বানিয়ে দেন যা তাদের এ মতবাদের সাথে খাপ খেয়ে যায়। এটা কুরআনের নিকৃষ্টতম অর্থগত বিকৃতি। এ বিকৃতি ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিকৃতিকেও ম্লান করে দিয়েছে। এ বিকৃতির মাধ্যমে কুরআনের একটি আয়াত এমন একটি অর্থ করা হয়েছে যা সমগ্র কুরআনের শিক্ষাকে বিকৃত করে দেয় এবং ইসলামের কোন একটি জিনিসকেও তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয় না। খিলাফতের এ সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর নিশ্চিতভাব এমন সব লোকের ওপর এ আয়াত প্রযোজ্য হয় যারা কখনো দুনিয়ায় প্রাধান্য ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করেছে অথবা বর্তমানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। তারা আল্লাহ, অহী, রিসালাত, আখেরাত সবকিছু অস্বীকারকারী হতে পারে এবং ফাসেকী ও অশ্লীলতার এমন সব মলিনতায় আপ্লুতও হতে পারে যেগুলোকে কুরআন কবীরা গুনাহ তথা বৃহৎ পাপ গণ্য করেছে, যেমন সুদ, ব্যভিচার, মদ, জুয়া। এখন যদি এসব লোক সৎ মুমিন হয়ে থাকে এবং এ জন্যই তাদেরকে খিলাফতের উন্নত আসনে অধিষ্ঠতি করা হয়ে থাকে, তাহলে এরপর ঈমানের অর্থ প্রাকৃতিক আইন মেনে নেয়া এবং সৎকর্মশীলতা অর্থ এ আইনগুলোক সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা ছাড়া আর কি হতে পারে। আর আল্লাহর পছন্দনীয় দীন বলতে প্রাণী বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ও জ্যোতিবিদ্যা পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে শিল্প,

কারিগরী, বাণিজ্য ও রাজনীতিতে ব্যাপক উন্নতি লাভ করা ছাড়া আর কি হতে পারে। এরপর আল্লাহর বন্দেগী বলতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে সাফল্য লাভ করার জন্য যেসব নিয়ম কানুন মেনে চলা প্রকৃতিগতভাবে লাভজনক ও অপরিহার্য হয়ে থাকে সেগুলো মেনে চলা ছাড়া আর কি হতে পারে। তারপর এ লাভজনক নিয়ম কানুনের সাথে কোন ব্যক্তি বা জাতি কিছু ক্ষতিকর পদ্ধতি অবলম্বন করলে তাকেই শির্‌ক নামে অভিহিত করা ছাড়া আর কাকে শির্‌ক বলা যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কখনো দৃষ্টি ও মন আচ্ছন্ন না রেখে বুঝে কুরআন পড়েছে সে কি কখনো একথা মেনে নিতে পারে যে, সত্যিই কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী ঈমান, সৎকাজ, সত্য দীন, আল্লাহর ইবাদাত এবং তাওহীদ ও শির্‌কের এ অর্থই হয়। যে ব্যক্তি কখনো পুরো কুরআন বুঝে পড়েনি এবং কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু আয়াত নিয়ে সেগুলোকে নিজের চিন্তা-কল্পনা ও মতবাদ অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়েছে সে-ই কেবল এ অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অথবা এমন এক ব্যক্তি এ কাজ করতে পারে, যে কুরআন পড়ার সময় এমন সব আয়াতকে একেবারেই অর্থহীন ও ভুল মনে করেছে যেগুলোতে আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ, তাঁর নাযিল করা অহীকে পথনির্দেশনার একমাত্র উপায় এবং তাঁর পাঠানো প্রত্যেক নবীকে চূড়ান্ত পর্যায়ে অপরিহার্যভাবে মেনে নেবার ও নেতা বলে স্বীকার করে অনুসরণ করার আহবান জানানো হয়েছে। আর এই সংগে বর্তমান দুনিয়াবী জীবনের শেষে দ্বিতীয় আর একটি জীবন কেবল মেনে নেবারই দাবী করা হয়েনি বরং একথাও পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা এ জীবনে নিজেদের জবাবদিহির কথা অস্বীকার করে বা এ ব্যাপারে সকল প্রকার চিন্তা বিমুক্ত হয়ে নিছক এ দুনিয়ায় সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করবে তারা চূড়ান্ত সাফল্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। কুরআনে এ বিষয়বস্তুগুলো এত বেশী পরিমাণে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারবার বলা হয়েছে যে, খিলাফত লাভ সম্পর্কিত এ আয়াতের এ নতুন ব্যাখ্যা দাতাগণ এ ব্যাপারে যে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন, যথার্থ সততা ও আন্তরিকতার সাথে এ কিতাব পাঠকারী কোন ব্যক্তি কখনো তার শিকার হতে পারেন, একথা মেনে নেয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ খিলাফত ও খিলাফত লাভের যে অর্থের ওপর তারা নিজেদের চিন্তার এ বিশাল ইমারত নির্মাণ করেছেন তা তাদের নিজেদের তৈরী। কুরআনের জ্ঞান রাখে এমন কোন ব্যক্তি কখনো এ আয়াতের এ অর্থ করতে পারেন না।

আসলে কুরআন খিলাফত ও খিলাফত লাভকে তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে। প্রত্যেক জায়গায় পূর্বাপর আলোচ্য বিষয় থেকে কোথায় এ শব্দটি কি অর্থে বলা হয়েছে তা জানা যায়।

এর একটি অর্থ হচ্ছে, ''আল্লাহর দেয়া ক্ষমতার অধিকারী হওয়া।'' এ অর্থ অনুসারে সারা দুনিয়ার সমস্ত মানব সন্তান পৃথিবীতে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, ''আল্লাহর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর শরীয়াতী বিধানের (নিছক প্রাকৃতিক বিধানের নয়) আওতায় খিলাফতের ক্ষমতা ব্যবহার করা।'' এ অর্থে কেবল মাত্র সৎ মুমিনই খলীফা

গণ্য হয়। কারণ সে সঠিকভাবে খিলাফতের হক আদায় করে। বিপরীত পক্ষে কাফের ও ফাসেক খলীফা নয় বরং বিদ্রোহী । কারণ তারা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাকে নাফরমানীর পথে ব্যবহার করে ।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, ''এক যুগের বিজয়ী ও ক্ষমতাশালী জাতির পরে অন্য জাতির তার স্থান দখল করা।'' খিলাফতের প্রথম দু'টি অর্থ গৃহীত হয়েছে ''প্রতিনিধিত্ব''। শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে। আর এ শেষ অর্থটি ''স্থলাভিষিক্ত''। শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। এ শব্দটির এ দু'টি অর্থ আরবী ভাষায় সর্বজন পরিচিত। এখন যে ব্যক্তিই এখানে এ প্রেক্ষাপটে খিলাফতলাভের আয়াতটি পাঠ করবে সে এক মুহূর্তের জন্যও এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করতে পারে না যে, এখানে খিলাফত শব্দটি এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা আল্লাহর শরীয়াতী বিধান অনুযায়ী (নিছক প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী নয়) তাঁর প্রতিনিধিত্বের যথাযথ হক আদায় করে। এ কারণেই কাফের তো দূরের কথা ইসলামের দাবীদার মুনাফিকদেরকেও এ প্রতিশ্রুতিতে শরীক করতে অস্বীকৃতি জানানো হচ্ছে। তাই বলা হচ্ছে,একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের গুণে গুণান্বিত লোকেরাই হয় এর অধিকারী। এ জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফল হিসেবে বলা হচ্ছে, আল্লাহর পছন্দনীয় দীন অর্থাৎ ইসলাম মজবুত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর বন্দেগীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ বন্দগীতে যেন শিরকের সামান্যতমও মিশেল না থাকে। এ প্রতিশ্রুতিকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আন্তর্জাতিক ময়দানে পৌঁছিয়ে দেয়া এবং আমেরিকা থেকে নিয়ে রাশিয়া পর্যন্ত যারই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির ডংকা দুনিয়ায় বাজতে থাকে তারই সমীপে এক নজরানা হিসেবে পেশ করা চূড়ান্ত মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ শক্তিগুলো যদি খিলাফতের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকে থাকে তাহলে ফেরাউন ও নমরূদ কি দোষ করেছিল, আল্লাহ কেন তাদেরকে অভিশাপলাভের যোগ্য গণ্য করেছেন।

এখানে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালের মুসলমানদের জন্য এ প্রতিশ্রুতি পরোক্ষভাবে পৌঁছে যায়। প্রত্যক্ষভাবে এখানে এমন সব লোককে সম্বোধন করা হয়েছিল যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ছিলেন। প্রতিশ্রুতি যখন দেয়া হয়েছিল তখন সত্যিই মুসলমানরা ভয়-ভীতির মধ্যে অবস্থান করছিল এবং দীন ইসলাম তখনো হিজাযের সরেজমিনে মজবুতভাবে শিকড় গেড়ে বসেনি। এর কয়েক বছর পর এ ভয়ভীতির অবস্থা কেবল নিরাপত্তায় বদলে যায়নি বরং ইসলাম আরব থেকে হয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার বৃহত্তর অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার শিকার কেবল তার জন্মভূমিতেই নয়, বহির্বিশ্বেও মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আল্লাহর তাঁর এ প্রতিশ্রুতি আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক ও উসমান গণী রাদিয়াল্লাহু আনহুমের জামানায় পুরা করে দেন, এটি একথার একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ। এরপর এ তিন মহান ব্যক্তির খিলাফতকে কুরআন নিজেই সত্যায়িত করেছে এবং আল্লাহ নিজেই এদের সৎমুমিন হবার সাক্ষ দিচ্ছেন, এ ব্যাপারে কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে সন্দেহ পোষন করা কঠিন। এ ব্যাপারে যদি কারোর মনে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তাঁর ''নাহ্জুল বালাগায়' সাইয়েদুনা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষন পাঠ করা দরকার। হযরত উমরকে ইরানীদের বিরুদ্ধে সশরীরে যুদ্ধে

অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য তিনি এ ভাষণটি দিয়েছিলেন। এতে তিনি বলেনঃ এ কাজের বিস্তার বা দুর্বলতা সংখ্যায় বেশী হওয়া ও কম হওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়। এ হচ্ছে আল্লাহর দীন। তিনি একে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করেছেন। আর আল্লাহর সেনাদলকে তিনি সাহায্য-সহায়তা দান করেছেন। শেষ পর্যন্ত উন্নতি লাভ করে তা এখানে পৌঁছে গেছে। আল্লাহ নিজেই আমাদের বলেছেনঃ আল্লাহ নিশ্চয়ই এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন এবং নিশ্চয়ই নিজের সেনানীদেরকে সাহায্য করবেন। মোতির মালার মধ্যে সূতোর যে স্থান, ইসলামে কাইয়েম তথা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারীও সে একই স্থানে অবস্থান করছেন। সূতো ছিড়ে গেলেই মোতির দানাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং শৃংখলা বিনষ্ট হয়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর আবার একত্র হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে সন্দেহ নেই, আরবরা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু ইসলাম তাদেরকে বিপুল সংখ্যায় পরিণত করেছে এবং সংঘবদ্ধতা তাদেরকে শক্তিশালী করে দিয়েছে। আপনি কেন্দ্রীয় পরিচালক হিসেবে এখানে শক্ত হয়ে বসে থাকুন, আরবের যাঁতাকে নিজের চারদিকে ঘুরাতে থাকুন এবং এখানে বসে বসেই যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে থাকুন। নয়তো আপনি যদি একবার এখান থেকে সরে যান তাহলে সবদিকে আরবীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে শুরু করবে এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছুবে যে, আপনাকে সামনের শত্রুর তুলনায় পেছনের বিপদের কথা বেশী করে চিন্তা করতে হবে। আবার ওদিকে ইরানীরা আপনার ওপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করবে। তারা মনে করবে, এই তো আরবের মূল গ্রন্থী, একে কেটে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কাজেই আপনাকে খতম করে দেবার জন্য তারা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। আর আজমবাসীরা এসময় বিপুল সংখ্যায় এসে ভীড় জমিয়েছে বলে যে কথা আপনি বলেছেন এর জবাবে বলা যায়, এর আগেও আমরা তাদের সাথে লড়েছি, তখনো সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে লড়িনি বরং আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তাই আজ পর্যন্ত আমাদের সফলকাম করেছে।"

জ্ঞানী পর্যবেক্ষক নিজেই দেখতে পারেন হযরত আলী (রা) এখানে কাকে খিলাফতলাভের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করছেন।

এখানে কুফরী করা মানে নিয়ামত অস্বীকার করাও হতে পারে আবার সত্য অস্বীকার করাও। প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে এর ক্ষেত্র হবে এমন সব লোক যারা খিলাফতের নিয়ামত লাভ করার পর সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়। আর দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে এর ক্ষেত্র হবে মুনাফিকবৃন্দ, যারা আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি শুনার পরও নিজের মুনাফিকী মনোভাব ও কর্মনীতি পরিহার করে না।

অধ্যায়-১০: সূরা আল ফুরকান (২৫) (সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী গ্রন্থ)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১২৪

সূরা আল ফুরকান (২৫) আয়াত ৫২

কাজেই তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না: আর কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে **সংগ্রাম কর- কঠোর (বৃহত্তম) সংগ্রাম।**

তাফসীর বলে

বৃহত্তম জিহাদের তিনটি অর্থ। এক, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা, অর্থাৎ চেষ্টা ও প্রাণপাত করার ব্যাপারে মানুষের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যাওয়া। দুই, বড় আকারের প্রচেষ্টা। অর্থাৎ নিজের সমস্ত উপায়-উপকরণ তার মধ্যে নিয়োজিত করা। তিন, ব্যাপক প্রচেষ্টা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রচেষ্টার কোন দিক এবং মোকাবিলার কোন ময়দান ছেড়ে না দেয়া। প্রতিপক্ষের শক্তি যেসব ময়দানে কাজ করছে সেসব ময়দানে নিজের শক্তি নিয়োজিত করা এবং সত্যের শির উঁচু করার জন্য যেসব দিক থেকে কাজ করার প্রয়োজন হয় সেসব দিক থেকে কাজ করা। **কণ্ঠ ও কলমের জিহাদ, ধন ও প্রাণের জিহাদ এবং বন্দুক ও কামানের যুদ্ধ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।**

অধ্যায়-১১: সূরা আল আনকাবূত (২৯) (মাকড়শা)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১২৫

সূরা আল আনকাবূত (২৯) আয়াত ০৬

যে লোক (আল্লাহর পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, সে তার নিজের কল্যাণেই প্রচেষ্টা চালায়, আল্লাহ সৃষ্টিজগত থেকে অবশ্যই বে-পরওয়া।

তাফসীর বলে

"মুজাহাদা" শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে, কোন বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, প্রচেষ্টা ও সাধনা করা। আর যখন কোন বিশেষ বিরোধী শক্তি চিহ্নিত করা হয় না বরং সাধারণভাবে "মুজাহাদা" শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় একটি সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব- সংঘাত। মু'মিনকে এ দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব- সংগ্রাম করতে হয় তা হচ্ছে এ ধরনের। তাকে শয়তানের সাথেও লড়াই করতে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ সৎকাজের ক্ষতির ভয় দেখায় এবং অসৎকাজের লাভ ও স্বাদ উপভোগের লোভ দেখিয়ে বেড়ায়। তাকে নিজের নফসের বা কুপ্রবৃত্তির সাথেও লড়তে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ নিজের খারাপ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার দাসে পরিণত করে রাখার জন্য জোর দিতে থাকে। নিজের গৃহ থেকে নিয়ে বিশ্ব-সংসারের এমন সকল মানুষের সাথে তাকে লড়তে হয় যাদের আদর্শ, মতবাদ, মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক নীতি, রসম- রেওয়াজ, সাংস্কৃতিক ধারা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান সত্য দ্বীনের সাথে সংঘর্ষশীল। তাকে এমন রাষ্ট্রের সাথেও লড়তে হয় যে আল্লাহর আনুগত্যমুক্ত থেকে নিজের ফরমান জারী করে এবং সততার পরিবর্তে অসততাকে বিকশিত করার জন্য শক্তি নিয়োগ করে। এ প্রচেষ্টা-সংগ্রাম এক-দু'দিনের নয়, সারাজীবনের। দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তের। কোন একটি ময়দানে নয় বরং জীবনের প্রত্যেকটি ময়দানের ও প্রতিটি দিকে। এ সম্পর্কেই হযরত হাসান বাসরী (র) বলেনঃ

"মানুষ যুদ্ধ করে চলে, যদিও কখনো একবারও তাকে তলোয়ার চালাতে হয় না।"

অর্থাৎ আল্লাহ এ জন্য তোমাদের কাছে এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের দাবী করছেন না যে, নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন এবং তোমাদের এ যুদ্ধ ছাড়া তার ইলাহী শাসন চলবে না, **বরং এটিই তোমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ, তাই তিনি তোমাদের এ**

দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ পথেই তোমরা দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টতার ঘূর্ণাবর্ত থেকে বের হয়ে সৎকর্মশীলতা ও সত্যতার পথে চলতে পারবে। এ পথে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন শক্তির অধিকারী হতে পারো যার ফলে দুনিয়ায় তোমরা কল্যাণ ও সুকৃতির ধারক এবং পরকালে আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী হবে। এ সংগ্রাম ও যুদ্ধ চালিয়ে তোমরা আল্লাহর কোন উপকার করবে না বরং তোমরা নিজেরাই উপকৃত হবে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১২৬

সূরা আল আনকাবূত (২৯) আয়াত ৬৯

যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।

তাফসীর বলে

"সংগ্রাম - সাধনার" ব্যাখ্যা এ সূরা আনকাবুতের ৮ টীকায় করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সংগ্রাম- সাধনা করবে সে নিজের ভালোর জন্য করবে (৬ আয়াত)। এখানে এ নিশ্চিন্ততা দান করা হচ্ছে যে, **যারা আল্লাহর পথে আন্তরিকতা সহকারে সারা দুনিয়ার সাথে সংঘর্ষের বিপদ মাথা পেতে নেয় তাদেরকে পথ দেখান এবং তার দিকে যাওয়ার পথ তাদের জন্য খুলে দেন।** তারা তার সন্তুষ্টি কিভাবে লাভ করতে পারে তা তিনি প্রতি পদে পদে তাদেরকে জানিয়ে দেন। পথের প্রতিটি বাঁকে তিনি তাদেরকে আলো দেখান। যার ফলে কোনটা সঠিক পথ ও কোনটা ভুল পথ তা তারা দেখতে চায়। তাদের নিয়ত যতই সৎ ও সদিচ্ছা প্রসূত হয় ততই আল্লাহর সাহায্য, সুযোগ- সুবিধা প্রদান ও হিদায়াতও তাদের সহযোগি হয়।

অধ্যায়-১২: সূরা আল আহযাব (৩৩) (জোট)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১২৭

সূরা আল আহযাব (৩৩) আয়াত ১৫

তারা পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন (যুদ্ধে) করবেনা। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ **ওহোদ যুদ্ধের সময় তারা যে দুর্বলতা দেখিয়েছিল তারপর লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করে তারা আল্লাহর কাছে অংগীকার করেছিল যে, এবার যদি পরীক্ষার কোন সুযোগ আসে তাহলে তারা নিজেদের এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে।** কিন্তু আল্লাহকে নিছক কথা দিয়ে প্রতারণা করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তিই তাঁর সাথে কোন অংগীকার করে তাঁর সামনে তিনি পরীক্ষার কোন না কোন সুযোগ এনে দেন। এর মাধ্যমে তার সত্য ও মিথ্যা যাচাই হয়ে যায়। **তাই ওহোদ যুদ্ধের মাত্র দু'বছর পরেই তিনি তার চাইতেও বেশী বড় বিপদ সামনে নিয়ে এলেন এবং এভাবে তারা তাঁর সাথে কেমন ও কতটুকু সাচ্চা অংগীকার করেছিল তা যাচাই করে নিলেন।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১২৮

সূরা আল আহযাব (৩৩) আয়াত ১৮

আল্লাহ তোমাদের মধ্যে **তাদেরকে নিশ্চিতই জানেন কারা (যুদ্ধে অংশগ্রহণে) বাধা সৃষ্টিকারী আর কারা নিজেদের ভাইদেরকে বলে- আমাদের কাছে এসো।** যুদ্ধ তারা সামান্যই করে

তাফসীর বলে

অর্থাৎ এ নবীর দল ত্যাগ করো। কেন তোমরা দীন, ঈমান, সত্য ও সততার চক্করে পড়ে আছো। **নিজেদেরকে বিপদ-আপদ, ভীতি ও আশংকার মধ্যে নিক্ষেপ করার পরিবর্তে আমাদের মতো নিরাপদে অবস্থান করার নীতি অবলম্বন করার নীতি অবলম্বন করো।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১২৯

সূরা আল আহযাব (৩৩) আয়াত ২০

তারা মনে করে সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। সম্মিলিত বাহিনী যদি আবার এসে যায়, তাহলে তারা কামনা করবে যে, যদি মরুচারীদের মধ্যে থেকে তারা তোমাদের সংবাদ নিতে পারত! **তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ সামান্যই করত।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৩০

সূরা আল আহযাব (৩৩) আয়াত ২৩

মু'মিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর সঙ্গে কৃত তাদের অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। **তাদের কতক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে (শাহাদাত বরণ) করেছে আর তাদের কতক অপেক্ষায় আছে। তারা (তাদের সংকল্প) কখনো তিল পরিমাণ পরিবর্তন করেনি।**

তাফসীর বলে

অর্থাৎ **কেউ আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে এবং কেউ তাঁর দীনের খাতিরে নিজের খুনের নজরানা পেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৩১

সূরা আল আহযাব (৩৩) আয়াত ২৫

আর আল্লাহ কাফিরদেরকে তাদের রাগের অবস্থাতেই ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। **যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।** আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৩২

সূরা আল আহযাব (৩৩) আয়াত ২৬

আর গ্রন্থধারীদের মধ্য হতে যারা তাদেরকে (অর্থাৎ সম্মিলিত কাফির বাহিনীকে) সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ হতে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। তাদের কতককে তোমরা হত্যা করলে, আর কতককে করলে বন্দী।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ **ইহুদি বনী কুরাইযা।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৩৩

সূরা আল আহযাব (৩৩) আয়াত ২৭

আর তিনি **তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দিলেন তাদের ভূমির, তাদের ঘরবাড়ির আর তাদের ধন-সম্পদের; আর এমন এক ভূখন্ডের যেখানে তোমরা (এখনও) অভিযানই পরিচালনা করনি।** আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৩৪

সূরা আল আহযাব (৩৩) আয়াত ৫০

হে নবী (সা.)! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে যাদের মোহরানা তুমি প্রদান করেছ; **আর বৈধ করেছি আল্লাহ ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ) হিসেবে তোমাকে যা দান করেছেন তার মধ্য হতে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে,** আর তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, তোমার মামার কন্যা ও তোমার খালার কন্যাকে যারা তোমার সঙ্গে হিজরাত করেছে। আর কোন মু'মিন নারী যদি নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করে আর নবী যদি তাকে বিয়ে করতে চায় সেও বৈধ, এটা মু'মিনদের বাদ দিয়ে বিশেষভাবে তোমার জন্য যাতে তোমার কোন অসুবিধে না হয়। মু'মিনগণের জন্য

তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার তা জানা আছে। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর বলে

যারা আপত্তি করে বলতো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো **অন্যদের জন্য একই সময় চারজনের বেশী স্ত্রী রাখতে নিষেধ করেন কিন্তু তিনি নিজে পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করলেন কেমন করে,"** এখানে আসলে তাদের জবাব দেয়া হয়েছে। এ আপত্তির ভিত্তি ছিল এরি ওপর যে, হযরত যয়নবকে (রা) বিয়ে করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিলেন চারজন। এদের একজন ছিলেন হযরত সওদা (রা)। তাঁকে তিনি বিয়ে করেছিলেন হিজরাতের ৩ বছর আগে। দ্বিতীয় ছিলেন হযরত আয়েশা (রা) তাঁকেও হিজরাতের ৩ বছর আগে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু হিজরী প্রথম বছরের শওয়াল মাসে তিনি স্বামীগৃহে আসেন। তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন হযরত হাফসা (রা) ৩ হিজরীর শাবান মাসে তাঁকে বিয়ে করেন। চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ৪ হিজরীর শওয়াল মাসে নবী করীম (সা) তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এভাবে হযরত যয়নব (রা) ছিলেন তার পঞ্চম স্ত্রী। এর বিরুদ্ধে কাফের ও মুনাফিকরা যে আপত্তি জানাচ্ছিল তার জবাব আল্লাহ এভাবে দিচ্ছেনঃ হে বনী! তোমার এ পাঁচজন স্ত্রী, যাদের মহর আদায় করে তুমি বিয়ে করেছো, তাদেরকে আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি। অন্যকথায় এ জবাবের অর্থ হচ্ছে, **সাধারণ মুসলমানদের জন্য চার-এর সীমা নির্দেশও আমিই করেছি এবং নিজের নবীকে এ সীমার উর্ধেও রেখেছি আমিই।** যদি তাদের জন্য সীমানির্দেশ করার ইখতিয়ার আমার থেকে থাকে, তাহলে নবীকে সীমার উর্ধে রাখার ইখতিয়ার আমার থাকবে না কেন।

এ জবাবের ব্যাপারে আবার একথা মনে রাখতে হবে যে, এর সাহায্যে কাফের ও মুনাফিকদেরকে নিশ্চিন্ত করা এর উদ্দেশ্য নয় বরং এমন মুসলমানদেরকে নিশ্চিন্ত করা এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম বিরোধীরা যাদের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল। তারা যেহেতু বিশ্বাস করতো, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহর নিজের শব্দসহই এ কুরআন নাযিল হয়েছে, তাই কুরআনের একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্বলিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ এ ঘোষণা দিয়েছেনঃ **নবী নিজেই নিজেকে চারজন স্ত্রী রাখার সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রাখেননি বরং ব্যবস্থা আমিই করেছি।**

পঞ্চম স্ত্রীকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হালাল করা ছাড়াও আল্লাহ এ আয়াতে তার জন্য আরো কয়েক ধরনের মহিলাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেনঃ

একঃ **আল্লাহ প্রদত্ত বাঁদীদের মধ্য থেকে যারা তাঁর মালিকানাধীন হয়। এ অনুমতি অনুযায়ী তিনি বনী কুরাইযার যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত রাইহানাকে (রা), বনিল মুসতালিকের যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত যুওয়াইরাকে (রা), খয়বরের যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত সফীয়াকে (রা) এবং মিসরের মুকাওকিস প্রেরিত হযরত মারিয়া কিবতিয়াকে (রা) নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন ।এদের**

মধ্য থেকে প্রথমোক্ত তিনজনকে তিনি মুক্তি দান করে তাদেরকে বিয়ে করেন। কিন্তু হযরত মারিয়া কিবতিয়ার (রা) সাথে মালিকানাধীন হবার ভিত্তিতে সহবাস করেন। তিনি তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন একথা তার সম্পর্কে প্রমাণিত নয়।

দুইঃ তাঁর চাচাত, মামাত, ফুফাত ও খালাত বোনদের মধ্য থেকে যারা হিজরাতে তাঁর সহযোগী হন। আয়াতে তার সাথে হিজরাত করার যে কথা এসেছে তার অর্থ এ নয় যে, হিজরাতের সফরে তার সাথেই থাকতে হবে বরং এর অর্থ ছিল, ইসলামের জন্য তারাও আল্লাহর পথে হিজরাত করেন। তার ওপরে **উল্লেখিত মুহাজির আত্মীয়দের মধ্য থেকেও যাকে ইচ্ছা তাকে বিয়ে করার ইখতিয়ারো তাকে দেয়া হয়। কাজেই এ অনুমতির ভিত্তিতে তিনি ৭ হিজরী সালে হযরত উম্মে হাবীবাকে (রা) বিয়ে করেন।** (পরোক্ষভাবে এ আয়াতে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়ছে যে, চাচা, মামা, ফুফী ও খালার মেয়েকে বিয়ে করা একজন মুসলমানের জন্য হালাল। এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াত খৃষ্ট ও ইহুদী উভয় ধর্ম থেকে আলাদা সাত পুরুষ পর্যন্ত পুরুষের বংশধারা মিলে যায়। আর ইহুদীদের সমাজে সহোদর ভাইঝি ও ভাগনীকেও বিয়ে করা বৈধ।)

তিনঃ **যে মু'মিন নারী নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য 'হিবা' তথা দান করে অর্থাৎ মহর ছাড়াই নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে তৈরি হয়ে যায় এবং নবী (সা) তা গ্রহণ করা পছন্দ করেন। এ অনুমতির ভিত্তিতে তিনি ৭ হিজরীর শওয়াল মাসে হযরত মায়মুনাকে (রা) নিজের সহধর্মিনী রূপে গ্রহণ করেন।** কিন্ত মহর ছাড়া তার হিবার সুযোগ নেয়া পছন্দ করেননি। তাই তার কোন আকাংখা ও দাবী ছাড়াই তাকে মহর দান করেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হিবাকারিনী স্ত্রী ছিল না। কিন্তু এর অর্থ আসলে হচ্ছে এই যে, তিনি হিবাকারিনী কোন স্ত্রীকেও মহর থেকে বঞ্চিত করেননি।

এ বাক্যটির সম্পর্ক যদি নিকটের বাক্যের সাথে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, অন্য কোন মুসলমানের জন্য কোন মহিলা নিজেকে তার হাতে হিবা করবে এবং সে মহর ছাড়াই তাকে বিয়ে করবে, এটা জায়েয নয়। আর যদি ওপরের সমস্ত ইবারতের সাথে এর সম্পর্ক মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, **চারটির বেশী বিয়ে করার সুবিধাও একমাত্র নবী করীমের (সা) জন্যই নির্দিষ্ট,** সাধারণ মুসলমানের জন্য নয়। এ আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, কিছু বিধান নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে, উম্মাতের অন্য লোকেরা এ ব্যাপারে তার সাথে শরীক নেই। কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে এ ধরনের বহু বিধানের কথা জানা যায়। যেমন নবী করীমের (সা) জন্য তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল এবং সমগ্র উম্মাতের জন্য তা নফল। তার ও তার পরিবারবর্গের জন্য সাদকা নেয়া হারাম এবং অন্য কারোর জন্য তা হারাম নয়। তার মীরাস বন্টন হতে পারতো না কিন্তু অন্য সকলের মীরাস বন্টনের জন্য সূরা নিসায় বিধান দেয়া হয়েছে। তার জন্য চারজনের অধিক স্ত্রী হালাল করা হয়েছে। স্ত্রীদের মধ্যে সমতাপূর্ণ ইনসাফ তার জন্য ওয়াজিব করা হয়নি। নিজেকে

হিবাকারী নারীকে মহর ছাড়াই বিয়ে করার অনুমতি তাঁকে দেয়া হয়েছে। তার ইন্তেকালের পর তার পবিত্র স্ত্রীগণকে সমগ্র উম্মাতের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে এমন একটি বিশেষত্ব ও নেই যা নবী করীম (সা) ছাড়া অন্য কোন মুসলমানও অর্জন করেছে। মুফাসসিরগণ তার আর একটি বৈশিষ্ট ও বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে এই যে, আহলি কিতাবের কোন মহিলাকে বিয়ে করাও তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। অথচ উম্মাতের সবার জন্য তারা হালাল।

সাধারণ নিয়ম থেকে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে আলাদা রেখেছেন তার মধ্যে রয়েছে এ সুবিধা ও কল্যাণ। "যাতে সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না থাকে"- এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ তাঁর প্রবৃত্তির লালসা খুব বেশী বেড়ে গিয়েছিল বলে তাকে বহু স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়া হয়, যাতে শুধুমাত্র চারজন স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে তিনি সংকীর্ণতা ও অসুবিধা অনুভব না করেন। এ বাক্যাংশের এ অর্থ কেবলমাত্র এমন এক ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে যে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতিতে অন্ধহয়ে একথা ভুলে যায় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৫ বছর বয়সে এমন এক মহিলাকে বিয়ে করেন যার বয়স ছিল তখন ৪০ বছর এবং পুরো ২৫ বছর ধরে তিনি তার সাথে অত্যন্ত সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করতে থাকেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি অন্য একজন অধিক বয়সের বিগত যৌবনা মহিলা হযরত সওদাকে (রা) বিয়ে করেন। পুরো চার বছর পর্যন্ত তিনি একাই ছিলের তার স্ত্রী। এখন কোন বুদ্ধিমান বিবেকবান ব্যক্তি একথা কল্পনা করতে পারে যে, ৫৩ বছর পার হয়ে যাবার পর সহসা তার যৌন কামনা বেড়ে যেতে থাকে এবং তার অনেক বেশী সংখ্যক স্ত্রীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আসলে "সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না থাকে"- এর অর্থ অনুধাবন করতে হলে একদিকে নবী করীমের (সা) ওপর আল্লাহ যে মহান দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন তার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং অন্যদিকে যে অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তাকে এ মহান দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য নিযুক্তকরেছিলেন তা অনুধাবন করা জরুরী। সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতি থেকে মন-মানসিতকাকে মুক্ত করে যে ব্যক্তিই এ দু'টি সত্য অনুধাবন করবেন তিনিই স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে তাকে ব্যাপক অনুমতি দেয়া কেন জরুরী ছিল এবং চারের সীমারেখা নির্দেশের মধ্যে তার জন্য কি সংকীর্ণতা ও অসুবিধা ছিল তা ভালোভাবেই জানতে পারবেন।

নবী করীমকে (সা) যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা ছিল এই যে, তিনি একটি অসংগঠিত ও অপরিপক্ক জাতিকে, যারা কেবল ইসলামী দষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং সাধারণ সভ্যতা সংস্কৃতির দৃষ্টিতেও ছিল অগোছালো ও অগঠিত, তাদেরকে জীবনের প্রতিটি বিভাগে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে একটি উন্নত পর্যায়ের সুসভ্য, সংস্কৃতিবান ও পরিচ্ছন্ন জাতিতে পরিণত করবেন। এ উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে অনুশীলন দেয়া যথেষ্ট ছিল না বরং মহিলাদের অনুশীলন ও সমান জরুরী ছিল। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে মূলনীতি শিখাবার জন্য তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন তার দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল এবং এ নিয়ম ভংগ করা ছাড়া তার পক্ষে মহিলাদেরকে সরাসরি অনুশীলন দান করা সম্ভবপর ছিল না। তাই মহিলাদের মধ্যে কাজ করার কেবলমাত্র একটি পথই তার জন্য খোলা

ছিল এবং সেটি হচ্ছে, বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন বৃদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদেরকে তিনি বিয়ে করতেন, নিজে সরাসরি তাদেরকে অনুশীলন দান করে তার নিজের সাহায্য সহায়তার জন্য প্রস্তুত করতেন এবং তারপর তাদের সাহায্যে নগরবাসী ও মরুচারী এবং যুবতী, পৌঢ় ও বৃদ্ধা সব ধরনের নারীদেরকে দীন, নৈতিকতা ও কৃষ্টি সংস্কৃতির নতুন নীতিসমূহ শিখবার ব্যবস্থা করতেন।

এ ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরাতন জাহেলী জীবন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় কার্যত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও দেয়া হয়েছিল। এ দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য জাহেলী জীবন ব্যবস্থার প্রবক্তা ও পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ অপরিহার্য ছিল। এ সংঘাত এমন একটি দেশে শুরু হতে যাচ্ছিল যেখানে গোত্রীয় জীবনধারা নিজের বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতির অবয়বে প্রচলিত ছিল। এ অবস্থায় অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে বিভিন্ন পরিবারে বিয়ে করে বহুবিধ বন্ধুত্বকে পাকাপোক্ত এবং বহুতর শত্রুতাকে খতম করার ব্যবস্থা করা তার জন্য জরুরী ছিল। তাই যেসব মহিলাকে তিনি বিয়ে করেন তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলী ছাড়াও তাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে এসব বিষয় ও কমবেশী জড়িত ছিল। হযরত আয়েশা (রা) এ হযরত হাফসাকে (রা) বিয়ে করে তিনি হযরত আবুবকর (রা) ও হযরত উমরের (রা) সাথে নিজের সম্পর্ককে আরো বেশী গভীর ও মজবুত করে নেন। **হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ছিলেন এমন এক পরিবারের মেয়ে যার সাথে ছিল আবু জেহেল ও খালেদ ইবনে ওলিদের সম্পর্ক। হযরত উম্মে হাবীবা (রা) ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে।** এ বিয়েগুলো সংশ্লিষ্ট পরিবার গুলোর শত্রুতার জের অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। বরং হযরত উম্মে হাবীবার সাথে নবী করীমের (সা) বিয়ে হবার পর আবু সুফিয়ান আর কখনো তার মোকাবিলায় অস্ত্র ধরেননি। হযরত সুফিয়া (রা), হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) ও হযরত রাইহানা (রা) ইহুদি পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তাদেরকে মুক্ত করে দিয়ে যখন নবী করীম (রা) তাদেরকে বিয়ে করেন তখন তার বিরুদ্ধে ইহুদিদের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ সে যুগের আরবীয় নীতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির সাথে কোন গোত্রের মেয়ের বিয়ে হতো তাকে কেবল মেয়েটির পরিবাবেরই নয় বরং সমগ্র গোত্রের জামাতা মনে করা হতো এবং জামাতার সাথে যুদ্ধ করা ছিল বড়ই লজ্জাকর।

সমাজের কার্যকর সংশোধন এবং তার জাহেলী রসম রেওয়াজ নির্মূল করাও তার নবুওয়াতের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। কাজেই এ উদ্দেশ্যেও তাকে একটি বিয়ে করতে হয়। এ সূরা আহযাবে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

এসব বিষয় বিয়ের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কোন রকম সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না রাখার তাগাদা করছিল। এর ফলে যে মহান দায়িত্ব তার প্রতি অর্পিত হয়েছিল তার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিয়ে করতে পারতেন।

যারা মনে করেন একাধিক বিয়ে কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই বৈধ এবং সেগুলো ছাড়া তা বৈধ হবার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, এ বর্ণনা থেকে তাদের চিন্তার বিভ্রান্তিও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। একথা সুস্পষ্ট যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একাধিক বিয়ে করার পেছনে তা স্ত্রীর রুগ্নতা, বন্ধ্যাত্ব বা সন্তানহীনতা অথবা এতিম প্রতিপালনের সমস্যা ছিল না। এসব সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়া তিনি সমস্ত বিয়ে করেন প্রচার ও শিক্ষামূলক প্রয়োজনে অথবা সমাজ সংস্কারার্থে কিংবা রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে। প্রশ্ন হচ্ছে, যখন আজ হাতেগোনা যে কয়টি বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বলা হচ্ছে আল্লাহ নিজেই সেগুলোরর জন্য একাধিক বিয়েকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি এবং আল্লাহর রসূল এগুলো ছাড়া অন্যান্য বহু উদ্দেশ্যে একাধিক বিয়ে করেছেন তখন অন্য ব্যক্তি আইনের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কতিপয় শর্ত ও বিধি-নিষেধ আরোপ করার এবং সে শরীয়াত অনুযায়ী এ নির্ধারণ করছে বলে দাবী করার কী অধিকার রাখে। আসলে একাধিক বিয়ে মূলতই একটি অপকর্ম, এই পাশ্চত্য ধারনাটি উক্ত সীমা নির্ধারণের মূলে কাজ করছে। উক্ত ধারণার ভিত্তিতে এ মতবাদের ও জন্ম হয়েছে যে, এ হারাম কাজটি যদি কখনো হালাল হয়েও যায় তাহলে তা কেবলমাত্র অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্যই হতে পারে। এখন এ বাইর থেকে আমদানী করা চিন্তার ওপর ইসলামের জাল ছাপ লাগাবার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন কুরআন ও সুন্নাহ এবং সমগ্র উম্মাতে মুসলিমার সাহিত্য এর সাথে মোটেই পরিচিত নয়।

অধ্যায়-১৩: সূরা আশ্-শূরা (৪২) (পরামর্শ)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৩৫

সূরা আশ্-শূরা (৪২) আয়াত ৩৯

আর **তাদের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হলে নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে।**

তাফসীর বলে

এটাও ঈমানদারদের একটা সর্বোৎকৃষ্ট গুণ। তারা জালেম ও নিষ্ঠুরদের জন্য সহজ শিকার নয়। তাদের কোমল স্বভাব এবং ক্ষমাশীলতা দুর্বলতার কারণে নয়। তাদের ভিক্ষু ও পাদরীদের মত মিসকীন হয়ে থাকার শিক্ষা দেয়া হয়নি। তাদের ভদ্রতার দাবী হচ্ছে বিজয়ী হলে বিজিতের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়। সক্ষম হলে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে মাফ করে এবং অধীনস্ত ও দুর্বল ব্যক্তির দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হলে তা উপেক্ষা করে যায়। **কিন্তু কোন শক্তিশালী ব্যক্তি যদি তার শক্তির অহংকারে তার প্রতি বাড়াবাড়ি করে তাহলে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাকে উচিত শিক্ষা দান করে। মু'মিন কখনো জালেমের কাছে হার মানে না এবং অহংকারীর সামনে মাথা নত করে না। এ ধরনের লোকদের জন্য তারা বড় কঠিন খাদ্য যা চিবানোর প্রচেষ্টাকারীর মাড়িই ভেঙে দেয়।**

অধ্যায়-১৪: সূরা মুহাম্মদ (৪৭) (নবী মুহাম্মদ)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৩৬

সূরা মুহাম্মদ (৪৭) আয়াত ০৪

অতঃপর **যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত হানো, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত কর, তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেল।** অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় **তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে।** এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেয়া হল। আল্লাহ ইচ্ছে করলে (নিজেই) তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (এজন্য তোমাদেরকে যুদ্ধ করার সুযোগ দেন)**। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তিনি তাদের কর্মফল কক্ষনো বিনষ্ট করবেন না।**

তাফসীর বলে

এ আয়াতে শব্দাবলী এবং যে পূর্বাপর প্রসংগে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তা থেকেও একথা স্পষ্ট জানা যায় যে, **আয়াতটি যুদ্ধের নির্দেশ আসার পর কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছিল**। "যখন কাফেরদের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হবে" কথাটিও ইংগিত দেয় যে, তখনও মোকাবিলা হয়নি বরং মোকাবিলা হলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে ।

যে সময় সূরা হজ্জের ৩৯ আয়াতে এবং সূরা বাকারার ১৯০ আয়াতে **যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং যার কারণে ভয়ে ও আতংকের মদীনার মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল এই যে, মৃত্যু যেন তাদের মাথার ওপর এসে হাজির হয়েছে, ঠিক সেই সময়ই যে, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তাতে এর ২০ আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয়**।

তাছাড়া সূরা আনফালের ৬৭-৬৯ আয়াতগুলো থেকেও এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতটি বদর যুদ্ধের আগেই নাযিল হয়েছিল । সেখানে বলা হয়েছেঃ

"শত্রুকে যুদ্ধে উচিত মত শিক্ষা দেয়ার আগেই নবীর হাতে তারা বন্দী হবে এমন কাজ কোন নবীর জন্য শোভনীয় নয়। তোমরা পার্থিব স্বার্থ কামনা করো। কিন্তু আল্লাহর বিচার্য বিষয় হচ্ছে আখেরাত। আল্লাহ বিজয়ীও জ্ঞানী। আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি আগেই লিপিবদ্ধ না থাকতো তাহলে তোমরা যা নিয়েছো সে জন্য তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হতো। সুতরাং যে অর্থ তোমরা অর্জন করেছো তা খাও। কারণ, তা হালাল ও পবিত্র" ।

এ বাক্যটি এবং বিশেষ করে এর নীচে দাগ টানা বাক্যাংশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ ক্ষেত্রে যে কারণে তিরস্কার করা হয়েছে তা হচ্ছে **বদর যুদ্ধে শত্রুদেরকে চরম শিক্ষা দেয়ার আগেই মুসলমানরা শত্রুদের লোকজনকে বন্দী করতে শুরু করেছিল**। অথচ যুদ্ধের পূর্বে সূরা মুহাম্মাদে তাদেরকে যে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছেঃ "তোমরা যখন তাদেরকে আচ্ছামত পদদলিত করে ফেলবে তখন বন্দীদের শক্ত করে বাঁধবে"। তা সত্ত্বেও সূরা মাহাম্মাদে যেহেতু মুসলমানদেরকে বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি মোটের ওপর দেয়া হয়েছিল তাই বদর যুদ্ধের বন্দীদের নিকট থেকে যে অর্থ নেয়া হয়েছিল আল্লাহ তা'আলা তা হালাল ঘোষণা করলেন এবং তা গ্রহণ করার জন্য মুসলমানদের শাস্তি দিলেন না। **"যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগেই লিপিবদ্ধ না থাকতো" কথাটি স্পষ্টত এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত দান করে যে, এ ঘটনার পূর্বেই কুরআন মজীদে মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। একথাটিও স্পষ্ট যে, কুরআনের সূরা মুহাম্মাদ ছাড়া এমন আর কোন আয়াত নেই যেখানে এ নির্দেশ আছে।** তাই একথা মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায়ান্তর নেই যে, এ আয়াতটি সূরা আনফালের পূর্বোল্লেখিত আয়াতের আগে নাযিল হয়েছিল।

এটি কুরআন মজীদের সর্বপ্রথম আয়াত যাতে যুদ্ধের আইন-কানুন সম্পর্কে প্রাথমিক দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ থেকে যেসব বিধি-বিধান উৎসারিত হয় এবং সে বিধি-বিধান অনুসারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কিরাম যেভাবে আমল করেছেন এবং ফিকাহবিদগণ এ আয়াত ও সুন্নাতের আলোকে গবেষণার ভিত্তিতে যেসব হুকুম-আহকাম রচনা করেছেন তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

একঃ **যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ থাকে শত্রুর সামরিক শক্তি ধ্বংস করা যাতে তার যুদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকে এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।** এ লক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে শত্রুর লোকজনকে বন্দী করতে লেগে যাওয়া অনুচিত। শত্রু সেনাদেরকে যুদ্ধবন্দী করার প্রতি মনেযোগ দেয়া কেবল তখনই উচিত যখন শত্রুর শক্তির আচ্ছামত মূলোৎপাটন হবে এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদের কেবল মুষ্টিমেয় কিছু লোকই অবশিষ্ট থাকবে । প্রারম্ভেই মুসলমানদেরকে এ দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল যাতে তারা মুক্তিপণ লাভ অথবা ক্রীতদাস সংগ্রহের লোভে পড়ে যুদ্ধের মূল লক্ষ ও উদ্দেশ্য ভুলে না বসে।

দুইঃ যুদ্ধে যারা গ্রেফতার হবে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের ইখতিয়ার আছে। তোমরা ইচ্ছা করলে, দয়াপরবশ হয়ে তাদের মুক্তি দাও অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও। এ থেকে এ সাধারণ বিধানের উৎপত্তি হয় যে, যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা যাবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

উমর (রা) হাসান বাসরী, আতা এবং হাম্মাদ এ আইনটিকে অবিকল এরূপ সর্বব্যাপী ও শর্তহীন আইন হিসেবেই গ্রহণ করেছেন এবং তা যথাস্থানে সঠিকও বটে। তারা বলেনঃ **যুদ্ধরত অবস্থায় মানুষকে হত্যা করা যেতে পারে।** কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এবং বন্দীরা আমাদের দখলে চলে আসলে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। ইবনে জারীর এবং আবু বরক জাসসাস বর্ণনা করেছেন যে হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ যুদ্ধ বন্দীদের একজনকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) হাতে দিয়ে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং এ আয়াত পড়ে বললেনঃ আমাদেরকে বন্দী অবস্থায় কাউকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সিয়ারুল কাবীর গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমের হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে (রা) এ যুক্তির ভিত্তিতেই সেই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করেছিলেন ।

তিনঃ কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু হত্যা করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়নি তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর এ নির্দেশের অভিপ্রায় বুঝেছেন এই যে, যদি এমন কোন বিশেষ কারণ থাকে যার ভিত্তিকে ইসলামী রাষ্টের শাসক কোন বন্দী অথবা কিছু সংখ্যক বন্দীকে হত্যা করা জরুরী মনে করেন তবে তিনি তা করতে পারেন। এটা কোন স্বাভাবিক ব্যাপকভিত্তিক নিয়ম-বিধি নয়, বরং একটি ব্যতিক্রমী নিয়ম -বিধি যা কেবল অনিবার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো হবে। **দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্য থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু উকবা ইবনে আবী ম'আইত এবং নাদ্বর ইবনে হারেসকে হত্যা করেছিলেন**। **ওহুদ যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে শুধু কবি আবু আযযকে হত্যা করেছিলেন**। বনী কুরাইযা গোত্রের নিজেরাই নিজেদেরকে হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের সিদ্ধান্তের ওপর সোপর্দ করেছিল এবং তাদের নিজেদের সমর্থিত বিচারকের রায় ছিল এই যে, তাদের পুরুষদের হত্যা করতে হবে, তাই তিনি তাদের হত্যা করিয়েছিলেন। **খায়বার যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে শুধু কিনান ইবনে আবীল হুকাইককে হত্যা করা হয়েছিল**। কারণ সে বিশ্বাসঘাকতা করেছিল। মক্কা বিজয়ের পরে সমস্ত মক্কাবাসীর মধ্য থেকে শুধু কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, **তাদের মধ্যে যে-ই বন্দী হবে তাকেই হত্যা করতে হবে।** এ কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোন যুদ্ধবন্দী হত্যা করা কখনে নবীর (সা) কর্মনীতি ছিল না। আর খোলাফায়ে রাশেদীনেরও কর্মধারা এরূপ ছিল। তাদের শাসন যুগেও যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করার দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা যায়। আর দু একটি দৃষ্টান্ত থাকলেও নির্দিষ্ট কোন কারণে তাদের হত্যা করা হয়েছিল- কেবল যুদ্ধবন্দী হবার করণে নয়। হযরত উমর ইননে আবদুল আযীযও তাঁর গোটা খিলাফাত যুগে শুধু একজন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করেছিলেন। এর কারণ ঐ ব্যক্তি মুসলমানদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। এ কারণেই অধিকাংশ ফিকাহবিদ এ মত সমর্থন করেছেন যে, **ইসলামী সরকার প্রয়োজন মনে করলে বন্দীদের হত্যা করতে পারেন।** তবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সরকারের। যাকে ইচ্ছা হত্যা করার অধিকার কোন সৈনিকেরই নেই। তবে বন্দী যদি পালিয়ে যাওয়ার কিংবা তার কোন প্রকার কুমতলবের আশংকা সৃষ্টি হয় তাহলে

যিনি এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামী ফিকাহবিদগণ আরো তিনটি বিষয় পরিস্কার করে বর্ণনা করেছেন। এক, বন্দী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না। দুই, বন্দীকে ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যা করা যাবে যতক্ষণ সে সরকারের হাতে থাকবে। বন্টন বা বিক্রির মাধ্যমে সে যদি অন্য কারো মালিকানুভুক্ত হয়ে যায় তাহলে আর তাকে হত্যা করা যাবে না। তিন, **বন্দীকে হত্যা করতে হলে সোজাসুজি হত্যা করতে হবে। কষ্ট দিয়ে হত্যা করা যাবে না।**

চারঃ যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে সাধারণভাবে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, হয় তাদের প্রতি দয়া করো নয় তো মুক্তিপণের আদান প্রদান করো।

ইহসানের মধ্যে চারটি জিনিস অন্তরভুক্ত। এক, বন্দী থাকা অবস্থায় তার সাথে ভাল আচরণ করতে হবে। দুই, হত্যা বা স্থায়ীভাবে বন্দী করার পরিবর্তে তাকে দাস বানিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। তিন, **জিযিয়া আরোপ করে তাকে জিম্মী অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রাপ্ত বানিয়ে নিতে হবে।** চার, কোন বিনিময় ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দিতে হবে ।

মুক্তিপণ গ্রহনের তিনটি পন্থা আছে। এক, অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া। দুই, মুক্তি দানের শর্ত হিসেবে বিশেষ কোন সেবা গ্রহণ করার পর মুক্তি দেয়া। তিন, শত্রুদের হাতে বন্দী নিজের লোকদের সাথে বিনিময় করা।

এসব বিবিধ পন্থা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন সময়ে সুযোগ মত আমল করেছেন। আল্লাহর দেয়া শরীয়াতী বিধন ইসলামী সরকারকে কোন একটি মাত্র উপায় ও পন্থার অনুসরণ বাধ্যতামূলক করে দেয়নি। সরকার যখন যে উপায় ও পন্থাটিকে সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করবে সে পন্থা অনুসারে কাজ করতে পারে।

পাঁচঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) আচরণ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, একজন যুদ্ধবন্দী যতক্ষণ সরকারের হাতে বন্দী থাকবে ততক্ষণ তার খাদ্য, পোশাক, ও অসুস্থ বা আহত হলে চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারের। বন্দীদের ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন রাখা কিংবা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার কোন বৈধতা ইসলামী শরীয়াতে নেই। বরং এর বিপরীত অর্থাৎ উত্তম আচরণ এবং বদান্যতামূলক ব্যবহার করার নির্দেশ যেমন দেয়া হয়েছে তেমনি নবীর বাস্তব কর্মকাণ্ডেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে বিভিন্ন সাহাবার পরিবারে বন্টন করে দিয়েছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "এসব বন্দীদের সাথে ভাল আচরণ করবে। "তাদের মধ্যে একজন বন্দী ছিলেন আবু আযীয। তিনি বর্ণনা করেনঃ "আমাকে যে আনসারদের পরিবারে রাখা হয়েছিল তারা আমাকে সকাল সন্ধায় রুটি খেতে দিত। কিন্তু নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে থাকতো। "অন্য একজন বন্দী সুহাইল ইবনে আমর সম্পর্কে নবীকে (সা) জানানো হলো যে, সে একজন অনলবর্ষী বক্তা। সে আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতো। তার দাঁত উপড়িয়ে দিন। জবাবে নবী (সা) বললেনঃ "আমি যদি তার

দাঁত উপড়িয়ে দেই তাহলে নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ আমার দাঁত উপড়িয়ে দেবেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম) ইয়ামামা অঞ্চলের নেতা সুমামা ইবনে উসাল বন্দী হয়ে আসলে সে বন্দী থাকা অবধি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে তার জন্য উত্তম খাদ্য ও দুধ সরবরাহ করা হতো। (ইবনে হিশাম) সাহাবায়ে কিরামের যুগেও এ কর্মপদ্ধতি চালু ছিল। তাঁদের যুগেও যুদ্ধবন্দীদের সাথে খারাপ আচরণের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

ছয়ঃ বন্দীদের স্থায়ীভাবে বন্দী করে রাখতে হবে-এবং সরকার তাদের থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করতে থাকবে ইসলাম এমন ব্যবস্থা আদৌ রাখেনি। যদি তাদের সাথে অথবা তাদের জাতির সাথে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের অথবা মুক্তিপণ আদায়ের কোন ব্যবস্থা না হয় সে ক্ষেত্রে **তাদের প্রতি ইহসান করার যে পন্থা রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, তাদেরকে দাস বানিয়ে ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে** এবং তাদের মালিকাদের নির্দেশ দিতে হবে যে, তারা যেন তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও এ নীতি অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে, সাহাবায়ে কিরামের যুগেও তা চালু ছিল এবং তা জায়েয হওয়া সম্পর্কে মুসলিম ফিকাহবিদগণ সর্বসম্মতিক্রমে মত প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি জানা থাকা দরকার তাহলো এই যে, বন্দী হওয়ার পূর্বেই যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং পরে কোনভাবে বন্দী হয়েছে তাকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দেয়া হবে। কিন্তু কেউ বন্দী হওয়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করলে অথবা কোন ব্যক্তির মালিকানাধীনে দিয়ে দেয়ার পরে মুসলমান হলে এভাবে ইসলাম গ্রহণ তার মুক্তির কারণ হতে পারে না। মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম এবং তিরমিযী হাদীস গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, বনী উকাইল গোত্রের এক ব্যক্তি বন্দী হয়ে আসলো এবং বললো যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যখন তুমি স্বাধীন ছিলে তখন যদি একথাটি বলতে তাহলে তুমি নিসন্দেহে সফলকাম হতে।"

হযরত উমর (রা) বলেছেনঃ

"বন্দী যদি মুসলমানের হাতে পড়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করে তহলে সে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে, তবে দাস থেকে যাবে।"

এরই ওপরে ভিত্তি করে মুসলিম ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, **বন্দী হওয়ার পরে ইসলাম গ্রহণকারী দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে না**। (আস সিয়ারুল কাবীর, ইমাম মুহাম্মাদ) একথাটি অত্যন্ত যুক্তিসংগতও বটে। কারণ, আমাদের আইন যদি এমন হতো যে, বন্দী হওয়ার পর যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করবে তাকেই মুক্তি করে দেয়া হবে তাহলে কালেমা পড়ে মুক্তি লাভ করতো না এমন কোন নির্বোধ বন্দী কি পাওয়া যেতো।

সাতঃ ইসলামে বন্দীদের প্রতি ইহসান করার তৃতীয় যে পন্থাটি আছে তা হচ্ছে **জিযিয়া আরোপ করে তাদেরকে দারুল ইসলামের যিম্মী (নিরাপত্তা প্রদত্ত) নাগরিক বানিয়ে নেয়া**। এভাবে তারা ইসলামী রাষ্ট্রে ঠিক তেমনি স্বাধীনতা নিয়ে থাকবে যেমন মুসলমানরা থাকে। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর আস সিয়ারুল কাবীর'

নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ "যেসব ব্যক্তিকে দাস বানানো বৈধ তাদের প্রত্যেকের ওপর জিযিয়া আরোপ করে যিম্মী নাগরিক বানানোও বৈধ"। অন্য এক স্থানে লিখেছেনঃ "তাদের ওপর যিজিয়া এবং তাদের ভূমির ওপর ভূমিকার আরোপ করে তাদেরকে প্রকৃতই স্বাধীন ও মুক্ত করে দেয়ার অধিকার মুসলমানদের শাসকের আছে"। বন্দী লোকেরা যে অঞ্চলের অধিবাসী সে অঞ্চল বিজিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হলে সে পরিস্থিতিতে সাধারণত এ নীতি -পদ্ধতি অনুসারে কাজ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, খায়বারের অধিবাসীদের বেলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে শহর এলাকার বাইরে ইরাকের প্রত্যন্ত অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর হযরত উমর (রা) ব্যাপকভাবে এ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। আবু উবায়েদ কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইরাক বিজিত হওয়ার পর সে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধি দল হযরত উমরের (রা) দরবারে হাজির হয়ে আবেদন জানালো যে, আমীরুল মু'মিনীন! ইতিপূর্বে ইরানবাসীরা আমাদের ঘাড়ে চেপেছিল। তারা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে, আমাদের সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে এবং আমাদের ওপর নানাভাবে বাড়াবাড়ি ও জুলুম করেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন আপনাদের পাঠালেন তখন আপনাদের আগমনের আমরা খুব খুশী হলাম। এবং আপনাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলিনি কিংবা যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করিনি। এখন আমরা শুনছি যে, আপনি আমাদের দাস বানিয়ে নিতে চাচ্ছেন। হযরত উমর (রা) জবাব দিলেনঃ **তোমাদের স্বাধীনতা আছে, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, কিংবা জিযিয়া দিতে স্বীকৃতি হয়ে স্বাধীন হয়ে যাও।** ঐ সব লোক জিযিয়া প্রদান করতে, স্বীকৃত হন এবং তাদেরকে স্বাধীন থাকতে দেয়া হয়। উক্ত গ্রন্থরই আরো এক স্থানে আবু উবায়েদ বর্ণনা করেন যে, হযরতউমর (রা) হযরত আবু মুসা আশ'আরীকে লিখেন, যুদ্ধে যাদের বন্দী করা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে কৃষকদের প্রত্যেককে ছেড়ে দাও।"

আটঃ ইহসান করার চতুর্থ পন্থা হলো, কোন প্রকার মুক্তিপণ বা বিনিময় না নিয়েই বন্দীকে ছেড়ে দেয়া। এটি একটি বিশেষ অনুকম্পা। বিশেষ কোন বন্দীর অবস্থা যখন এরূপ অনুকম্পা প্রদর্শনের দাবী করে কিংবা যদি আশা থাকে যে, এ অনুকম্পা সে বন্দীকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবে এবং সে শত্রু না থেকে বন্ধু এবং কাফের না থেকে মু'মিন হয়ে যাবে তাহলে কেবল সে অবস্থায়ই ইসলামী সরকার তা করতে পারে। অন্যথায় এ বিষয়টি সর্বজন বিদিত যে, মুক্তিলাভ করার পর সে পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসবে এ জন্য শত্রু কওমের কোন ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়া কোনক্রমেই যুক্তি দাবী হতে পারে না। এ কারণেই মুসলিম ফিকাহবিদগণ ব্যাপাকভাবে এর বিরোধিতা করেছেন এবং এর বৈধতার জন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, যদি মুসলমানদের ইমাম বন্দীদের সবাইকে কিংবা তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে ইহসান বা অনুকম্পার ভিত্তিতে ছেড়ে দেয়া যুক্তিসংগত মনে করেন তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। (আস সিয়ারুল কাবীর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর প্রায় সব ক্ষেত্রেই যৌক্তিকতা ও উপকারিতার দিকটা সুস্পষ্ট।

বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে নবী (সা) বলেছেনঃ
"মুতইম ইবনে আদ্দী যদি জীবিত থাকতো আর সে এসব জঘন্য লোকগুলো সম্পর্কে আমার সাথে আলোচনা করতো তাহলে আমি তার খাতিরে এদের ছেড়ে দিতাম।"(বুখারী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা এ জন্য বলেছিলেন যে, তিনি যে সময় তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরেছিলেন সে সময় মুতইমই তাঁকে নিজের আশ্রয়ে নিয়েছিলেন এবং তার ছেলে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজের হিফাজতে তাঁকে হারাম শরীফে নিয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি এভাবে তার ইহসানের প্রতিদান দিতে চাচ্ছিলেন।
বুখারী, মুসলিম এবং মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়ামামার নেতা সুমাম ইবনে উসাল বন্দী হয়ে আসলে নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ সুমামা, তোমার বক্তব্য কি। সে বললোঃ "আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবেনঃ যার রক্তের কিছু মুল্য আছে, যদি আমার প্রতি ইহসান করেন তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি ইহসান করা হবে যে ইহসান স্বীকার করে। আর যদি আপনি অর্থ চান তাহলে তা আপনাকে প্রদান করা হবে"। তিনদিন পর্যন্ত তিনি তাকে একথাটিই জিজ্ঞেস করতে থাকলেন আর সে-ও একই জবাব দিতে থাকলো। অবশেষে তিনি সুমামাকে ছেড়ে দিতে আদেশ দিলেন। মুক্তি পাওয়া মাত্র সে নিকটবর্তী একটি খেজুরের বাগানে গিয়ে গোসল করে ফিরে আসলো এবং কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে বললো, আজকের দিনের আগে আমার কাছে আপনার চেয়ে কোন ব্যক্তি এবং আপনার দীনের চেয়ে কোন দীন অধিক ঘৃণীত ছিল না। কিন্তু এখন আমার কাছে আপনার চেয়ে কোন ব্যক্তি এবং আপনার দীনের চেয়ে কোন দীন অধিক প্রিয় নয় । এরপরে সে উমরা করার জন্য মক্কা গেল এবং সেখানে কুরাইশদের জানিয়ে দিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আজকের দিনের পরে ইয়ামামা থেকে কোন শস্য তোমরা পাবে না। সে প্রকৃতপক্ষে তাই করলো। ফলে মক্কাবাসীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবেদন জানাতে হলো, তিনি যেন ইয়ামামা থেকে তাদের রসদ বন্ধ করিয়ে না দেন ।
বনু কুরাইযার বন্দীদের মধ্য থেকে তিনি যাবীর ইবনে বাতা এবং আমর ইবনে সা'দ (অথবা সু'দা) এর মৃত্যুদন্ড রহিত করে দিলেন। তিনি যাবীরকে মুক্তি দিলেন এ কারণে যে, জাহেলী যুগে বুআস যুদ্ধের সময় সে হযরত সাবেত ইবনে কায়েসকে আশ্রয় দিয়েছিল। তাই তিনি তাকে সাবেতের হাতে তুলে দিলেন যাতে তিনি তাকে তাঁর প্রতি কৃত ইহসানের প্রতিদান দিতে পারেন। আর আমর ইবনে সা'দকে ছেড়ে ছিলেন এ জন্য যে, বনী কুরাইযা গোত্র যখন নবীর (সা) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সে সময় এ ব্যক্তিই তার গোত্রকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে নিষেধ করেছিলো। (কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ)।
বনী মুসতালিক যুদ্ধের পর যখন উক্ত গোত্রের বন্দীদের এনে সবার মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলো তখন হযরত জুয়াইরিয়া যার অংশে পড়েছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার বিনিময়ে দিয়ে

মুক্ত করলেন এবং এরপর নিজেই তাকে বিয়ে করলেন। এতে সমস্ত মুসলমান তাদের অংশের বন্দীদেরও মুক্ত করে দিলেন। কারণ, এখন তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়। এভাবে একশ'টি পরিবারের ব্যক্তিবর্গ মুক্তি লাভ করলো। (মুসনাদে আহমাদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ সীরাতে ইবনে হিশাম)।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মক্কার ৮০ ব্যক্তি তানয়ীমের দিকে এগিয়ে আসে এবং ফজরের নামাযের সময় তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্যাম্পে আকস্মিক আক্রমণ চালানোর সংকল্প করে। তাদের সবাইকে বন্দী করা হয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে ছেড়ে যাতে এ নাজুক পরিস্থিতিতে এ বিষয়টি যুদ্ধের কারণ হয়ে না দাঁড়য় । (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

মক্কা বিজয়ের সময় কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত সকলকে তিনি অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যাদের বাদ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যেও তিন চারজন ছাড়া কাউকে হত্য করা হয়নি। মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের ওপর কিভাবে জুলুম করেছিল তা আরবরা সবাই জানতো। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করার পর যে মহত উদারতা সাথে নবী (সা) তাদের ক্ষমা করেছিলেন তা দেখে আরববাসীরা অন্তত এতটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলো যে, তাদের মোকাবিলা কোন নিষ্ঠুর ও কঠোর হৃদয় জালেমের সাথে নয়, বরং অত্যন্ত দয়াবান ও উদার নেতার সাথে। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের পর গোটা আবর উপদ্বীপ অনুগত হতে দু বছর সময়ও লাগেনি।

হুনায়েন যুদ্ধের পর হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল তাদের বন্দীদের মুক্ত করার জন্য যখন হাযির হলো তখণ সমস্ত বন্দীদের বন্টন করা হয়ে গিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মুসলমানকে একত্রিত করে বললেনঃ এরা সবাই তাওবা করে হাযির হয়েছে। আমার মত হলো তাদের বন্দীদের তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক। তোমাদের মধ্যে যে তার অংশের বন্দীকে বিনিময় ছাড়াই সন্তুষ্ট চিত্তে ছেয়ে দিতে চায় সে যেন তাই করে। আর যে এর বিনিময় চায় তাকে আমি বায়তুলমালে সর্বপ্রথম যে অর্থ আমদানী হবে তা থেকে পরিশোধ করে দেব। এভাবে ছয় হাজার বন্দীকে মুক্ত করে দেয়া হলো যারা বিনিময় চেয়েছিলো সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বিনিময় প্রদান করা হলো। (বুখারী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ) এ থেকে এ বিষয়টিও জানা গেল যে, **বন্টিত হওয়ার পর সরকার নিজে বন্দীদের মুক্ত করে দেয়ার অধিকার রাখে না বরং বন্দীদেরকে যেসব লোকের মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের সম্মাতির ভিত্তিতে অথবা বিনিময় দিয়ে তা করা যেতে পারে।**

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে সাহাবীদের যুগেও ইহসান করে বন্দীদের মুক্তি দান করার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর (রা) আশয়াস ইবনে কায়েস কিন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং হযরত উমর (রা) হুরমুযানকে এবং মানাযিরও মায়াসানের বন্দীদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। (কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ)

নয়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অর্থের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দেয়ার দৃষ্টান্ত কেবল বদর যুদ্ধের সময় দেখা যায়। **সে সময় একজনের বন্দীকে এক হাজার থেকে ৪ হাজার পর্যন্ত মুদ্রা নিয়ে মুক্তি দেয়া হয়েছিল**। (তাবকাতে ইবনে সা'দ, কিতাবুল আমওয়াল) সাহাবায়ে কিরামের যুগে এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মুসলিম ফিকাহবিদগণ ব্যাপকভাবে এরূপ করা অপছন্দ করেছেন। কারণ, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমরা অর্থের বিনিময়ে শত্রুদের কাউকে ছেড়ে দেব আর যে পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবে। তবে কুরআন মজীদে যেহেতু মুক্তিপণ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সে অনুযায়ী আমল করেছেন তাই এ কাজ একেবারে নিষিদ্ধ নয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) আস সিয়ারুল কাবীর গ্রন্থে বলেনঃ **"প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলমানরা অর্থের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দিতে পারেন।"**

দশঃ যুদ্ধবন্দীদেরকে কোন সেবা গ্রহণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার দৃষ্টান্তও বদর যুদ্ধের সময় দেখ যায়। কুরাইশ বন্দীদের মধ্যে যাদের আর্থিক মুক্তিপণ দেয়ার ক্ষমতা ছিল না তাদের মুক্তি দেয়ার জন্য নবী (সা) শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, তারা আনসারদের দশজন করে শিশুকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে। (মুসনাদে আহমাদ, তাবকাতে ইবনে সাদ কিতাবুল আমওয়াল)।

এগারঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা বন্দী বিনিময়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। একবার নবী (সা) হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি অভিযানে পাঠালেন। এতে কয়েকজন বন্দী হয়ে আসলো। তাদের মধ্যে জনৈকা পরমা সুন্দরী নারীও ছিল। সে সালামা ইবনুল আকওয়ার অংশে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বার বার বলে মহিলাকে চেয়ে নিলেন এবং তাকে মক্কায় পাঠিয়ে তার বিনিময়ে বহু মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করালেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তাহাবী, কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ, তাবকাতে, ইবনে সা'দ)। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেনঃ একবার সাকীফ গোত্র দুজন মুসলমানকে বন্দী করে। এর কিছুদিন পর সাকীফের মিত্র বনী উকাইলের এক ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। নবী (সা) তাকে তায়েফে পাঠিয়ে তার বিনিময়ে ঐ দুজন মুসলমানকে মুক্ত করে আনেন। (মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ) ফিকাহবিদদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম, শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদের মতে বন্দী বিনিময় জায়েজ। ইমাম আবু হানিফার একটি মত হচ্ছে, বিনিময় না করা উচিত। কিন্তু তাঁরও দ্বিতীয় মত হচ্ছে বিনিময় করা যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, বন্দীদের যে মুসলমান হয়ে যাবে বিনিময়ের মাধ্যমে তাকে কাফেরদের হাতে তুলে দেয়া যাবে না।

এ ব্যাখ্যার দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের জন্য এমন একটি ব্যাপক আইন রচনা করেছে যার মধ্যে প্রত্যেক যুগে এবং সব রকম পরিস্থিতিতে এ সমস্যার মোকাবিলা করার অবকাশ আছে। যারা কুরআন মজীদের এ আয়াতটির শুধু এ সংক্ষিপ্ত অর্থ গ্রহণ করে যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে ইহসান বা অনুকম্পা করে ছেড়ে দিতে হবে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে তারা জানে না যুদ্ধবন্দী

সম্পর্কিত বিষয়টি কত ভিন্ন ভিন্ন দিক থাকতে পারে এবং বিভিন্ন যুগে তা কত সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে পারে।

৯. অর্থাৎ বাতিলের পূজারীদের মাথা চূর্ণ করাই যদি আল্লাহ তা'আলার একমাত্র কাজ হতো তাহলে তা করার জন্য তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী হতেন না। তাঁর সৃষ্ট ভূমিকম্প বা ঝড়-তুফান চোখের পলকেই এ কাজ করতে পারতো। কিন্তু তিনি চান মানুষের মধ্যে যারা ন্যায় ও সত্যের অনুসারী তারা বাতিলের অনুসারীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হোক এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুক। যাতে যার মধ্যে যে গুণাবলী আছে তা এ পরীক্ষায় সুন্দরও পরিমার্জিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকেই তার কর্মের বিচারে যে অবস্থান ও মর্যালাভের উপযুক্ত তাকে দেয়া যায়।

১০. অর্থাৎ আল্লাহর পথে কারো নিহত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, কেউ নিহত হলেই তার ব্যক্তিগত সব কাজ-কর্মই ধ্বংস হয়ে গেল। কেউ যদি একথা মনে করে যে, শহীদদের ত্যাগ ও কুরবানী তাদের নিজেদের জন্য উপকারী নয় বরং তাদের পরে যারা এ পৃথিবীতে জীবিত থাকলো এবং তাদের ত্যাগ ও কুরবানী দ্বারা লাভবান হলো তারাই শুধু কল্যাণ লাভ করলো তাদের ভুল বুঝেছে। প্রকৃত সত্য হলো শাহাদাত লাভ করলো তাদের নিজেদের জন্যও এটি লোকসানের নয় লাভের বাণিজ্য।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৩৭

সূরা মুহাম্মদ (৪৭) আয়াত ২০

মু'মিনরা বলে- একটি সূরাহ নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন **কোন সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরাহ অবতীর্ণ হয় আর তাতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ থাকে,** তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে তুমি তাদেরকে দেখবে মৃত্যুর ভয়ে জ্ঞানহারা লোকের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। কাজেই ধ্বংস তাদের জন্য।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ **সে সময় মুসলমানরা যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলো এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে কাফেরদের যে আচরণ ছিল তার কারণে যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বেই মুসলমানদের সাধারণ মতামত ছিল এই যে, এখন আমাদের যুদ্ধের অনুমতি পাওয়া উচিত।** তারা ব্যাকুল চিত্তে আল্লাহর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করেছিলো এবং বার বার জানতে চাচ্ছিলো যে, এ জালেমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে লড়াই করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না কেন। কিন্তু যারা মুনাফিকীর আবরণে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছিল। তাদের অবস্থা ছিল মু'মিনদের অবস্থা থেকে ভিন্ন। তারা তাদের প্রাণ ও অর্থ-সম্পদকে আল্লাহ ও তাঁর দীনের চেয়ে অনেক বেশী প্রিয় মনে করতো এবং সে ক্ষেত্রে কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে

প্রস্তুত ছিল না। যুদ্ধের নির্দেশ আসা মাত্রই তাদেরকে এবং খাঁটি ঈমানদারদেরকে বাছাই করে পরস্পর থেকে আলাদা করে দিন। এ দির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদের ও ঈমানদারদের মধ্যে বাহ্যিক কোন পার্থক্য দেখা যেতো না। তারা এবং এরা উভয়েই নামায পড়তো। রোযা রাখতেও তাদের কোন দ্বিধা-সংকোচ ছিল না। ঠাণ্ডা প্রকৃতির ইসলাম তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু যখন ইসলামের জন্য জীবন বাজি রাখার সময় আসলো তখন তাদের মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং ঈমানের লোক দেখানো যে মুখোশ তারা পরেছিল তা খুলে পড়লো। তাদের এ অবস্থা সূরা নিসায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ "তোমরা কি সে লোকদের দেখেছো যাদের বলা হয়েছিলো, নিজের হাতকে সংযত রাখো, নাযাম কায়েম করো , এবং যাকাত দাও। **এখন তাদেরকে যখন যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন তাদের এক দলের অবস্থা এই যে, মানুষকে এমন ভয় পাচ্ছে যে, ভয় আল্লাহকে করা উচিত।** বরং তার চেয়ে বেশী ভয় পাচ্ছে। তারা বলছেঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে যুদ্ধের এ নির্দেশ কেন দিলে। আমাদেরকে আরো কিছু অবকাশ দিলে না কেন। (আয়াত ৭৭)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৩৮

সূরা মুহাম্মদ (৪৭) আয়াত ৩৫

কাজেই তোমরা সাহস-হারা হয়ে যেও না আর সন্ধির আবেদন করে বসো না, প্রবল তো তোমরাই। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের 'আমাল কক্ষনো বিনষ্ট করবেন না।

তাফসীর বলে

এখানে এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে, এমন এক সময় একথাটি বলা হয়েছিল, **যখন মদীনার ক্ষুদ্র জনপদে মুহাজির ও আনসারদের একটি ক্ষুদ্র দল ইসলামের পতাকা বহন করেছিলো।** তাদেরকে শুধু কুরাইশদের মত শক্তশালী গোত্রের মোকাবিলা করতে হচ্ছিলো না বরং গোটা আরবের ও মুশরিকদের মোকাবিলা করতে হচ্ছিলো। এমন এক পরিস্থিতিতে বলা হচ্ছে সাহস হারিয়ে এ দুশমনদের সন্ধির আহবান জানাবে না, বরং জীবন বাজি রাখার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। মুসলমনারা কোন সময়ই সন্ধির জন্য আলোচনা করবে না একথার অর্থ তা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে সন্ধির আলোচনা করা ঠিক নয় যখন তার অর্থ দাঁড়াবে নিজেদের দূর্বলতা প্রকাশ করা। এবং তাতে শত্রু আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। **মুসলমানদের উচিত প্রথমে নিজেদের শক্তিমত্তা দেখিয়ে দেয়া।** এরপর সন্ধির জন্য আলোচনা করলে কোন ক্ষতি নেই।

অধ্যায়-১৫: সূরা আল ফাতহ (৪৮) (বিজয়, মক্কা বিজয়)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৩৯

সূরা আল ফাতহ (৪৮) আয়াত ১৫

তোমরা যখন গানীমাতের মাল সংগ্রহ করার জন্য যেতে থাকবে তখন পিছনে থেকে যাওয়া লোকগুলো বলবে- 'আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহর ফরমানকে বদলে দিতে চায়। বল 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না, **(খাইবার অভিযানে অংশগ্রহণ এবং সেখানে পাওয়া গানীমাত কেবল তাদের জন্য যারা ইতোপূর্বে হুদাইবিয়ার সফর ও বাই'আতে রিয্ওয়ানে অংশ নিয়েছে)** এমন কথা আল্লাহ পূর্বেই বলে দিয়েছেন। তখন তারা বলবে- 'তোমরা বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ করছ।' (এটা যে আল্লাহর হুকুম তা তারা বুঝছে না) বরং তারা খুব কমই বুঝে।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ অচিরেই এমন সময় আসছে যখন এসব লোক - যারা আজ তোমার সংগে এ বিপজ্জনক অভিযানে অংশ গ্রহণ এড়িয়ে গেল - তোমাকে এমন এক অভিযানে যেতে দেখবে যাতে তারা সহজ বিজয় এবং প্রচুর গনীমতের সম্পদ হস্তগত হচ্ছে বলে মনে করবে। তখন তারা নিজেরাই দৌড়ে এসে বলবে, আমাদেরকেও সাথে নিয়ে চলুন। **বস্তুত হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির তিন মাস পরই সে সুযোগ আসলো যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের বিরুদ্ধে অভিযানে চালিয়ে অতি সহজেই তা দখল করে নিলেন। সে সময় প্রত্যেকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো, কুরাইশদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর এখন শুধু খায়বারই নয়, তায়ামা, ফাদাক, ওয়াদিউল কুরা এবং উত্তর হিজাযের অন্য সব ইহুদীও মুসলমানদের শক্তির মোকাবিলা করতে পারবে না। এসব জনপদ এখন পাকা ফলের মতো সহজেই মুসলমানদের দখলে চলে আসবে।** তাই আল্লাহ তা'আলা এসব আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আগেই এ মর্মে সতর্ক করে দিলেন যে, মদীনার আশেপাশের সুযোগ সন্ধানী লোকেরা এসব সহজ বিজয় অর্জিত হতে দেখে তাতে ভাগ বসানোর জন্য এসে হাজির হবে। কিন্তু তুমি তাদেরকে

পরিস্কার বলে দেবে যে, তোমাদেরকে এতে ভাগ বসানোর সুযোগ দেখা কখনো দেয়া হবে না। এটা তাদের প্রাপ্য যারা বিপদ -মুসিবতের মোকাবিলায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো।

আল্লাহর ফরমান অর্থ খায়বার অভিযানে নবীর (সা) সাথে কেবল তাদেরকেই যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে যারা হুদাইবিয়া অভিযানেও তাঁর সাথে গিয়েছিলেন এবং বাইয়াত রিদওয়ানেও তাঁর সাথে শরীক হয়েছিলেন। **আল্লাহ তায়ালা খাইবারের গনীমতের সম্পদ তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।** পরবর্তী ১৮ আয়াতে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

"আল্লাহ পূর্বেই একথা বলেছেন", কথাটি দ্বারা লোকের মনে এ মর্মে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, এ আয়াতের আগে এ বিষয়বস্তু সম্বলিত আরো কোন নির্দেশ নাযিল হয়ে থাকবে। এখানে সে দিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। আর যেহেতু এ সূরার মধ্যে এ বিষয় সম্বলিত কোন নির্দেশ এর আগে পাওয়া যায় না। তাই তারা কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে তা অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং সূরা তাওবার ৮৪ আয়াত তারা পেয়ে যায় যাতে আরেকটি প্রসংগে এ একই বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃপক্ষে ঐ আয়াত এ ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। কারণ, ঐ আয়াত তাবুক যুদ্ধের প্রসংগে নাযিল হয়েছিলো। আর তা নাযিল হয়েছিলো সূরা ফাতহ নাযিল হওয়ার তিন বছর পর। প্রকৃত ব্যাপার হলো, এ আয়াতটিতে এ সূরারই ১৮ ও ১৯ আয়াতের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। আর "ইতিপূর্বেই আল্লাহ বলছেন" কথাটির অর্থ এ আয়াতের পূর্বে বলা নয়, বরং পেছনে রেখে যাওয়া লোকদের সাথে এ কথাবার্তা হতে যাচ্ছিলো -যে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আগেই দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে- খায়বার অভিযানে যাওয়ার সময়। অথচ সম্পূর্ণ সূরাটির - যার মধ্যে ১৮ ও ১৯ আয়াত আছে - তার তিন মাস পূর্বে হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে নাযিল হয়েছিলো। বক্তব্যের ধারা যদি পাঠক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর রসূলকে এই বলে নির্দেশনা দিচ্ছিন যে, তোমার মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর পিছনে থেকে যাওয়া এসব লোক যখন তোমার কাছে এসে এসব ওজর পেশ করবে তখন তাদেরকে এ জবাব দিবে এবং খায়বার অভিযানে যাত্রাকালে যখন তারা তোমার সাথে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করবে তখন তাদের একথা বলবে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৪০

সূরা আল ফাতহ (৪৮) আয়াত ১৬

বেদুঈনদের যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বল- **'তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে ডাকা হবে খুবই শক্তিশালী এক জাতির বিরুদ্ধে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে।** তোমরা যদি তখন তা মান্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে

উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পিঠ ফিরিয়ে নাও যেমন তোমরা আগে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছিলে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দিবেন।

তাফসীর বলে

মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হচ্ছে। এর দুটি অর্থ হতে পারে এবং এখানে দুটি অর্থই উদ্দেশ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, **তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। অপরটি হচ্ছে, তারা ইসলামী সরকারের বশ্যতা স্বীকার করবে।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৪১

সূরা আল ফাতহ (৪৮) আয়াত ১৭

অন্ধের উপর কোন দোষ নেই, খোঁড়ার উপর কোন দোষ নেই, রোগীর উপর কোন দোষ নেই। আর যে কেউই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। **আর যে ব্যক্তি পিঠ ফিরিয়ে নিবে, তিনি তাকে কষ্টদায়ক শাস্তি দিবেন।**

তাফসীর বলে

অর্থাৎ **জিহাদে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির সামনে প্রকৃতই কোন ওজর প্রতিবন্ধক হবে তার কোন দোষ নেই।** কিন্তু সুঠাম ও সবলদেহী মানুষ যদি ছল-ছুতার ভিত্তিতে বিরত থাকে তাহলে তাকে আল্লাহ ও তাঁর দীনের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান বলে স্বীকার করা যায় না। তাকে এ সুযোগও দেয়া যায় না যে, সে মুসলিম সমাজের অন্তরভুক্ত হওয়ার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু যখন ইসলামের জন্য কুরবানী পেশ করার সময় আসবে তখন নিজের জান ও মালের নিরাপত্তার চিন্তায় বিভোর হবে।

এখানে জেনে নেয়া দরকার যে, শরীয়াতে যাদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে তারা দু'ধরনের মানুষ। এক, যারা দৈহিকভাবে যুদ্ধের উপযুক্ত নয়। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বালক, নারী, পাগল, অন্ধ, সামরিক সেবা দিতে অক্ষম এমন রোগগ্রস্ত লোক এবং হাত পা অকেজো হওয়ার কারণে যুদ্ধের অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম ব্যক্তিরা। দুই, অন্য কিছু যুক্তিসংগত কারণে যাদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুত, কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করতে অক্ষম। অথবা এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, অতি সত্বর যার ঋণ পরিশোধ করা দরকার এবং ঋণদাতা যাকে অবকাশ দিচ্ছে না। অথবা এমন ব্যক্তি যার পিতা-মাতা বা তাদের কোন একজন জীবিত আছে এবং তারা তার সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন যে, পিতা-মাতা যদি মুসলমান হয়

তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়া সন্তানের জিহাদে যাওয়া উচিত নয়। তবে তারা যদি কাফের হয়, **তাহলে তাদের বাধা দেয়ার কারো জিহাদ থেকে বিরত থাকা জায়েজ নয়।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৪২

সূরা আল ফাতহ (৪৮) আয়াত ১৮

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা (হুদাইবিয়ায়) গাছের তলে তোমার কাছে বায়'আত নিল। আল্লাহ জানতেন তাদের অন্তরে কী আছে, এজন্য তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আর পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে দিলেন নিকট আসন্ন বিজয়।

তাফসীর বলে

হুদাইবিয়া নামক স্থানে সাহাবায়ে কিরামের কাছে যে বাইয়াত নেয়া হয়েছিল এখানে পুনরায় তার উল্লেখ করা হচ্ছে। এ বাইয়াতকে "বাইয়াতে রিদওয়ান" বলা হয়ে থাকে। কারণ, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দান করেছেন যে, যারা এ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে জীবন বাজি রাখতে সমান্য দ্বিধাও করেনি এবং রসূলের হাত হাত দিয়ে জীবনপাত করার বাইয়াত করে ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। সময়টি ছিল এমন যে, মুসলমানগণ শুধুমাত্র একখানা করে তরবারি নিয়ে এসেছিলেন এবং সংখ্যায় ছিলেন মাত্র চৌদ্দশ'। তাদের পরিধানেও সামরিক পোশাক ছিল না বরং ইহরামের চাদর বাধা ছিল। নিজেদের সামরিক কেন্দ্র (মদীনা) থেকে আড়াইশ' মাইল এবং শত্রুদের দূর্গ থেকে মাত্র ১৩ মাইল দূরে ছিল যেখান থেকে শত্রুরা সব রকমের সাহায্য লাভ করতে পারতো। আল্লাহ ও তাঁর সূর এবং তাঁর দীনের প্রতি এ মানুষগুলোর মনে যদি আন্তরিকতার সামান্য ঘাটতিও থাকতো তাহলে তারা এ চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিত্যাগ করে চলে যেতো এবং ইসলাম বাতিলের সাথে লড়াইয়ে চিরদিনের জন্য হেরে যেতো। আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা ছাড়া বাইরের এমন কোন চাপ তাদের ওপর ছিল না যা তাদেরকে এ বাইয়াত গ্রহণে বাধ্য করতে পারতো। আল্লাহর দীনের জন্য সবকিছু করতে সে মুহূর্তেই তাদের প্রস্তুত হয়ে যাওয়া স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, তাঁরা তাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী ও আন্তরিক এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে পূর্ণতার স্তরে উন্নীত। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদ দান করেছেন। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার পর কেউ যদি তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি হয় কিংবা তাদেরকে তিরস্কার করার সাহস করে তাহলে তাদের বুঝাপড়া তাদের সাথে নয়, আল্লাহর সাথে। এ ক্ষেত্রে যারা বলে, যে সময় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদ দান করেছিলেন তখন

তাঁরা আন্তরিক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু পরে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য হারিয়ে ফেলেছেন, তারা সম্ভবত আল্লাহ সম্পর্কে এ কুধারণা পোষণ করে যে, এ আয়াত নাযিল করার সময় তিনি তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতেন না। তাই শুধু এ সে সময়কার অবস্থা দেখে তিনি তাদেরকে এ সনদ পত্র দিয়ে ফেলেছেন। আর সম্ভবত এ না জানার কারণেই তাঁর পবিত্র কিতাবেও তা অন্তরভুক্ত করেছেন যাতে পরে যখন এরা অবিশ্বাসী হয়ে যাবে তখনো দুনিয়ার মানুষ তাদের সম্পর্কে এ আয়াত পড়তে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার 'গায়েবী ইলম' সম্পর্কে বাহবা দিতে থাকে যিনি (নাউযুবিল্লাহ) ঐ অবিশ্বাসীদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদপত্র দান করেছিলেন।

যে গাছর নীচে এ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সেটি সম্পর্কে হযরত ইবনে উমরের আযাতকৃত ক্রীতদাস নাফের এ বর্ণনাটি সাধারণভাবে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে যে, লোকজন সেখানে গিয়ে নামায পড়তে শুরু করেছিলো। বিষয়টি জানতে পেরে হযরত উমর (রা) লোকদের তিরস্কার করেন এবং গাছটি কাটিয়ে ফেলেন। (তাবকাতে ইবনে সাদ ২য় খন্ড পৃঃ ১০০) কিন্তু এর বিপরীতমুখী কয়েকটি বর্ণনাও রয়েছে। হযরত নাফে, থেকেই তাবকাতে ইবনে সা'দে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, বাইয়াতে রিদওয়ানের কয়েক বছর পর সাহাবায়ে কিরাম ঐ গাছটি তালাশ করেছিলেন কিন্তু চিনতে পারেননি এবং সে গাছটি কোনটি সে ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় (পৃঃ ১০৫) দ্বিতীয় বর্ণনাটি বুখারী, মুসলিম ও তবকাতে ইবনে সা'দে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের। তিনি বলেনঃ আমার পিতা বাইয়াতে রিদওয়ান শরীক ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন পরের বছর আমরা যখন উমরাতুল কাযার জন্য গিয়েছিলাম তখন গাছটি হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনুসন্ধান করেও তার কোন হদিস করতে পারিনি। তৃতীয় বর্ণনাটি ইবনে জারীরের। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফত কালে যখন হুদাইবিয়া অতিক্রম করেন তখন জিজ্ঞেস করেন, যে গাছটি নিজে বাইয়াত হয়েছিলো তা কোথায়। কেউ বলে, অমুক গাছটি এবং কেউ বলেন অমুকটি। তখন হযরত উমর (র) বলেন, এ কষ্ট বাদ দাও, এর কোন প্রয়োজন নেই।

এখানে; অর্থ মনের সে বিশেষ অবস্থা যার ওপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তি কোন মহত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঠাণ্ডা মনে পূর্ণ প্রশান্তি ও তৃপ্তি সহ নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয় এবং কোন ভয় বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ফলাফল যাই হোক না কেন এ কাজ করতেই হবে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৪৩

সূরা আল ফাতহ (৪৮) আয়াত ১৯

এবং **বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে;** আল্লাহ পরাক্রমশালী,

তাফসীর বলে

এটা খায়বার বিজয় ও সেখানকার গনীমতের সম্পদের প্রতি ইংগিত। আর এ আয়াত এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, আল্লাহ তা'আলা এ পুরস্কারটি কেবল তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যারা বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন। এ বিজয় ও গনীমতের সম্পদে তাদের ছাড়া আর করো শরীক হওয়ার অধিকার ছিল না। এ কারণে ৭ম হিজরী সনের সফর মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার আক্রমণের জন্য যাত্রা করলেন তখন তিনি কেবল তাদেরকেই সংগে নিলেন। এতে সন্দেহ নেই যে, পরে নবী (সা) **হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজির এবং দাওস ও আশয়ারী গোত্রের কোন কোন সাহাবীকেও খায়বারের গনীমতের মাল থেকে কিছু অংশ দিয়েছিলেন। তবে তা হয় খুমুস (এক -পঞ্চামাংশ) থেকে নয়তো বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের সম্মিতিক্রমে দিয়েছিলেন। কাউকে তিনি ঐ সম্পদের হকদার বানাননি।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৪৪

সূরা আল ফাতহ (৪৮) আয়াত ২০

আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ গানীমাতের (যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ) ও'য়াদা দিয়েছেন যা তোমরা লাভ করবে। এটা তিনি তোমাদেরকে আগেই দিলেন আর মানুষদের (অর্থাৎ মাক্কার কুরায়শদের) হাতকে তোমাদের (উপর পতিত হওয়া) থেকে সংযত করে রাখলেন যাতে তা মু'মিনদের জন্য একটা নিদর্শন হয় (যে প্রকৃত মু'মিনদেরকে আল্লাহ অতি সংকটময় মুহূর্তেও রক্ষা করতে পারেন), আর তিনি তোমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

তাফসীর বলে

খায়বার বিজয়ের পর মুসলমানরা ক্রমাগত আর যেসব বিজয় লাভ করে এর দ্বারা সেসব বিজয়কে বুঝানো হয়েছে।

এর অর্থ হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি। এ চুক্তিকেই সূরার প্রারম্ভে ফাকহে মুবীন' (সুস্পষ্ট বিজয়) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অর্থাৎ তিনি কাফের কুরাইশদের এতটা সাহস দেননি যে, হুদাইবিয়াতে তারা তোমাদের সাথে লড়াই বাধিয়ে বসতে পারতো। অথচ সমস্ত বাহ্যিক অবস্থার দিক থেকে তারা অনেক ভাল অবস্থানে ছিল এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তোমাদের পাল্লা তাদের চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল বলে মনে হচ্ছিলো। এ ছাড়াও এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, সে সময় কোন শত্রুশক্তি মদীনার ওপর আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। অথচ

যুদ্ধক্ষম চৌদ্দশ' যোদ্ধা পুরুষ মদীনার বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মদীনার যুদ্ধক্ষেত্র অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো এবং ইহুদী ও মুশরিক ও মুনাফিকরা এ পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে পারতো।
অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের নীতিতে স্থির সংকল্প থাকে এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা করে ন্যায় ও সত্যের পক্ষ অবলম্বের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আল্লাহ তাদের কতভাবে সাহায্য -সহযোগিতা দান করেন পুরস্কৃত করেন তার নিদর্শন।
অর্থাৎ তোমরা আরো দূরদৃষ্টি ও দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করবে। ভবিষ্যতেও এভাবেই আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে ন্যায় ও সত্যের পথে অগ্রসর হতে থাকবে। আর এসব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদান করবে যে, আল্লাহর দীন যে পদক্ষেপের দাবী করছে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে সে পদক্ষেপ গ্রহণ করাই মু'মিনের কাজ। আমার শক্তি কতটা এবং বাতিলের শক্তি কত প্রবল এ বাছ বিচার ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে যেন সে পড়ে না থাকে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৪৫

সূরা আল ফাতহ (৪৮) আয়াত ২১

এবং আরো অন্য (সাহায্য, সম্পদ ও বিজয়) যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ তা স্বীয় আয়ত্তে রেখেছেন, আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

তাফসীর বলে

খুব সম্ভবত এখানে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইংগিত দান করা হয়েছে। কাতাদাও এ মত পোষণ করেছেন এবং ইবনে জারীরও এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহর একথাটার উদ্দেশ্য যা বুঝা যায় তা হচ্ছে, মক্কা এখনো তোমাদের করায়ত্ব হয়নি। তবে তাকে আল্লাহ পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন এবং হুদাইবিয়ার এ বিজয়ের ফলশ্রুতিতে তাও তোমাদের করায়ত্ব হবে।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৪৬

সূরা আল ফাতহ (৪৮) আয়াত ২২

কাফিরগণ যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধাত, তাহলে তারা অবশ্যই পিঠ ফিরিয়ে নিত, সে অবস্থায় তারা কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী পেত না।

তাফসীর বলে

অর্থাৎ **হুদাইবিয়াতে যুদ্ধ হলে তোমাদের পরাজিত হওয়ার সম্ভবনা ছিল।** আল্লাহ এ জন্য সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেননি তা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন কিছু যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হচ্ছে। **সে উদ্দেশ্য ও কৌশল যদি বাধা না হতো এবং আল্লাহর তা'আলা এখানে যুদ্ধ সংঘটিত হতে দিতেন তাহলে নিশ্চিতভাবে কাফেরদের পরাজয় বরণ করতো এবং পবিত্র মক্কা তখন বিজিত হতো।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৪৭

সূরা আল ফাতহ (৪৮) আয়াত ২৩

(এটাই) আল্লাহর বিধান, অতীতেও তাই হয়েছে, তুমি আল্লাহর বিধানে কক্ষনো কোন পরিবর্তন পাবে না।

তাফসীর বলে

এখানে আল্লাহর বিধান বলতে বুঝানো হয়েছে, **যেসব কাফের আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন এবং তাঁর রসূলকে সাহায্য করেন।**

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৪৮

সূরা আল ফাতহ (৪৮) আয়াত ২৪

মক্কা উপত্যকায় তিনিই তাদের হাত তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাত তাদের থেকে বিরত রেখেছিলেন তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।

অধ্যায়-১৬: সূরা আল হুজুরাত (৪৯) (বাসগৃহ সমুহ)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৪৯

সূরা আল হুজুরাত (৪৯) আয়াত ১৫

মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর কোনরূপ সন্দেহ করে না, **আর তাদের মাল দিয়ে ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে; তারাই সত্যবাদী।**

অধ্যায়-১৭: সূরা আল হাশর (৫৯) (সমাবেশ)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৫০

সূরা আল হাশর (৫৯) আয়াত ০২

কিতাবধারীদের অন্তর্ভুক্ত কাফিরদেরকে আক্রমণের প্রথম ধাপেই তিনিই তাদের বাড়ী থেকে বের ক'রে দিলেন। তোমরা ধারণাও করনি যে, তারা বের হবে। আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ ('র কবল) থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে এমন দিক থেকে পাকড়াও করলেন যা তারা ভাবতেও পারেনি। তিনি তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন। তারা তাদের নিজেদের হাত দিয়েই নিজেদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করল, আর মু'মিনদের হাতেও (ধ্বংস করাল)। অতএব হে দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

তাফসীর বলে

মূল শব্দ হলো। হাশর শব্দের অর্থ বিক্ষিপ্ত জনতাকে একত্র করা অথবা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যক্তিদের একত্রিত করে বের হওয়া। আর এর অর্থ হলো, প্রথমবার একত্রিত হওয়ার সাথে অথবা প্রথমবার একত্রিত হওয়ার সময়ে। এখন প্রশ্ন হলো, এখানে প্রথম হাশর বলতে কি বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। **একদলের মতে এর অর্থ মদীনা থেকে বনী নাযীরের বহিষ্কার।** একে প্রথম হাশর এই অর্থে বলা হয়েছে যে, তাদের দ্বিতীয় হাশর হয়েছিলো হযরত 'উমরের (রা) সময়ে। এই সময় ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আর তাদের শেষ হাশর হবে কিয়ামতের দিন। **দ্বিতীয় দলের মতে এর অর্থ হলো মুসলমানদের সৈন্য সমাবেশের ঘটনা যা বনী নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য করা হয়েছিল** সুতরাং এর অর্থ হলো, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুসলমানরা সবেমাত্র একত্রিত হয়েছিলো। লড়াই ও রক্তপাতের কোন অবকাশই সৃষ্টি হয়নি। ইতিমধ্যেই আল্লাহ তা'আলার কুদরাতের তারা দেশান্তরিত হতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। অন্য কথায় এখানে এ বাক্যাংশটি আক্রমণের "প্রথম চোটে" বা "প্রথম আঘাতে" অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী এর অনুবাদ করেছেনঃ। শাহ আবদুল কাদের সাহেবের অনুবাদ হলোঃ আমাদের মতে এই দ্বিতীয় অর্থটিই এ আয়াতাংশের সঠিক ও বোধগম্য অর্থ।

এখানে প্রথমেই একটি বিষয়ে বুঝে নেয়া উচিত, **যাতে বনী নাযীরের বহিষ্কারের ব্যাপারে কোন মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়।** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বনী নাযীর গোত্রের যথারীতি একটি লিখিত চুক্তি ছিল। এ চুক্তিকে তারা বাতিলও করেছিলো না যে, তার কোন অস্তিত্ব নেই মনে করা চলে। তবে যে কারণে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল তা হলো, এই চুক্তি লংঘনের অনেকগুলো ছোট বড় কাজ করার পর তারা এমন একটি কাজ করে বসেছিল যা সুস্পষ্টভাবে চুক্তিভংগেরই নামান্তর। অর্থাৎ তারা চুক্তির অপর পক্ষ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আর তাও এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো যে, সে জন্য তাদেরকে চুক্তিভংগের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে তারা তা অস্বীকার করতে পারেনি। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দশদিন সময় দিয়ে এই মর্মে চরমপত্র দিলেন যে, এই সময়ের মধ্যেই তোমরা মদীনা ছেড়ে চলে যাও। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। এই চরম পত্র ছিল সম্পূর্ণরূপে কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুসারে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ "যদি তোমরা কোন কওমের পক্ষ থেকে বিশ্বাসভংগের (চুক্তিলংঘনের) আশংকা কর তাহলে সেই চুক্তি প্রকাশ্যে তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।" (সূরা আল আনফাল-৫৮) এ কারণে তাদের বহিষ্কারকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ, তা ছিল আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক। যেন তাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ বহিষ্কার করেননি, বরং আল্লাহ তা'আলা নিজে বহিষ্কার করেছেন। দ্বিতীয় যে কারণটির জন্য তাদের বহিষ্কারকে আল্লাহ তা'আলা নিজের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন তা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। একথাটি বুঝার জন্য মনে রাখা দরকার যে, বনী নাযীর শত শত বছর ধরে এখানে প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে বসবাস করে আসছিল। মদীনার বাইরে তাদের গোটা জনবসতি একই সাথে ছিল। নিজের গোত্রের লোকজন ছাড়া আর কোন গোত্রের লোকজন তাদের মধ্যে ছিল না। গোটা বসতি এলাকাকে তারা একটি দুর্গে রূপান্তিরিত করেছিল। সাধারণত বিশৃংখলাপূর্ণ ও নিরাপত্তাহীন উপজাতীয় এ এলাকায় ঘর-বাড়ী যেভাবে নির্মাণ করা হয়ে থাকে তাদের ঘর-বাড়ীও ঠিক তেমনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। এগুলো ছিল ছোট ছোট দুর্গের মত। তাছাড়া তাদের সংখ্যাও সেই সময়ের মুসলমানদের সংখ্যার চেয়ে কম ছিল না। এমনকি মদিনার অভ্যন্তরেও বহু সংখ্যক মুনাফিক তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। তাই মুসলমানরাও কখনো এ আশা করেনি যে, লড়াই ছাড়া শুধু আবরোধের কারণেই দিশেহারা হয়ে তারা নিজেদের বসতভিটা ছেড়ে চলে যাবে। বনু নাযীর গোত্রের লোকজন নিজেরাও একথা কল্পনা করেনি যে, কোন শক্তি মাত্র ছয় দিনের মধ্যেই তাদের হাত থেকে এ জায়গা ছিনিয়ে নেবে। তাদের পূর্বে যদিও বনু কায়নুকা গোত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো এবং নিজেদের বীরত্বের অহংকার তাদের কোন কাজেই আসেনি। কিন্তু তারা ছিল মদীনার অভ্যন্তরে এক মহল্লার অধিবাসী। তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র কোন দুর্গ-

প্রাকার বেষ্টিত জনপদ ছিল না। তাই বনী নাযীর গোত্র মনে করতো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের টীকে থাকতে না পারা অযৌক্তিক বা অসম্ভব কিছু ছিল না। পক্ষান্তরে তারা নিজেদের সুরক্ষিত জনপদ এবং মজবুত দুর্গসমূহ দেখে ধারণাও করতে পারতো না যে, এখান থেকে কেউ তাদের বহিষ্কার করতে পারে। এ **কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার চরমপত্র দিলে তারা অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে খোলাখুলি জবাব দিল, আমরা এখান থেকে চলে যাব না।** আপনার কিছু করার থাকলে করে দেখতে পারেন।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্নটি হলো, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে একথা বললেন যে, তারা মনে করে নিয়েছিলো তাদের ছোট ছোট দুর্গের মত বাড়ীঘর তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করবে। বনী নাযীর কি সত্যি সত্যিই জানতো যে, তাদের মোকাবিলা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে নয়, বরং খোদ আল্লাহর সাথে। আর এটা জানার পরেও কি তারা একথা বিশ্বাস করেছিল যে, তাদের দুর্গসমূহ আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে। যারা ইহুদী জাতির মানসিকতা এবং তাদের শত শত বছরের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত নয় এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির মনে এ প্রশ্ন দ্বিধা ও সংশয়ের সৃষ্টি করবে। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে কেউ ধারণাও করতে পারে না যে, আল্লাহর সাথে মোকাবিলা হচ্ছে সচেতনভাবে একথা জেনে শুনেও তারা এ ধরণের খোশ খেয়ালে মত্ত থাকবে এবং ভাববে যে, তাদের দুর্গ এবং অস্ত্রশস্ত্র তাদেরকে আল্লাহর থেকে রক্ষা করবে। এ কারণে একজন অনভিজ্ঞ লোক এখানে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ করবেন এই যে, বনী নাযীর বাহ্যত নিজেদের সুদৃঢ় দুর্গসমূহ দেখে ভুল ধারণা করে বসেছিল যে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে । কিন্তু বাস্তবে তাদের মোকাবিলা ছিল আল্লাহর সাথে। এ আক্রমণ থেকে তাদের দুর্গসমূহ তাদের রক্ষা করতে সক্ষম ছিল না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই পৃথিবীতে ইহুদীরা একটি অদ্ভুত জাতি যারা জেনে বুঝেও আল্লাহর মোকাবিলা করে আসছে। তারা আল্লাহর রসূলদেরকে আল্লাহর রসূল জেনেও হত্যা করেছে এবং অহংকার বুক ঠুকে বলেছে, আমরা আল্লাহ রসূলকে হত্যা করেছি। এ জাতির লোকগাঁথায় রয়েছে যে "তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়া'কূবের (আ) সাথে আল্লাহ তা'আলার সারা রাত ধরে কুস্তি হয়েছে এবং ভোর পর্যন্ত লড়াই করেও আল্লাহ তা'আলা তাকে তাকে পরাস্ত করতে পারেনি। অতপর ভোর হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেনঃ এখন আমাকে যেতে দাও। এতে ইয়া'কূব (আ) বললেনঃ যতক্ষণ না তুমি আমাকে বরকত দেবে ততক্ষণ আমি তোমাকে যেতে দেব না। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার নাম কি। তিনি বললেনঃ ইয়া'কূব। আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ ভবিষ্যতে তোমার নাম ইয়া'কূব হবে বরং 'ইসরাঈল' হবে। কেননা তুমি খোদা ও মানুষের সাথে শক্তি পরিক্ষা করে বিজয়ী হয়েছো। " দেখুন ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থের (The Holy Scriptures) আধুনিকতম অনুবাদ, প্রকাশক, জুয়িশ পাবলীকেশন সোসাইটি অব আমেরিকা, ১৯৫৪ , আদিপুস্তক অধ্যায় ৩২, শ্লোক ২৫ থেকে ২৯। খৃষ্টানদের অনুদিত বাইবেলেও এ বিষয়টি

একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইহুদীদের অনুবাদের ফুটনোটে 'ইসরাঈল 'শব্দের অর্থ লেখা হয়েছেঃ (He who Striveth with God) অর্থাৎ যিনি খোদার সাথে শক্তি পরীক্ষা করেন। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিকাল লিটারেচারে খৃস্টান পুরোহিতগণ ইসরাঈল শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ (Wreslter with God) "খোদার সাথে কুস্তি লড়নেওয়ানা।" হোশেয় পুস্তকে হযরত ইয়াকূবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "তিনি তাঁর যৌবনে খোদার সাথে কুস্তি লড়েছেন। তিনি ফেরেশতার সাথে কুস্তি করে বিজয়ী হয়েছেন।"(অধ্যায় ১২, শ্লোক ৪) অতএব একথা স্পস্ট যে, বনী ইসরাঈলরা মহান সেই ইসরাঈলের বংশধর যার সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হলো, তিনি খোদার সাথে শক্তি পরীক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন। তাই খোদার সাথে মোকাবিলা একথা জেনে বুঝেও খোদার বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত হওয়া তাদের জন্য এমন কি আর কঠিন কাজ । এ কারণে তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুসারে তারা আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছে এবং একই কারণে তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুসারে তারা আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছে এবং একই কারণে তাদের নিজেদের ধারণা অনুসারে তারা হযতর ঈসাকে শূলে চড়িয়েছে এবং বুক ঠুকে বলেছেঃ (আমরা আল্লাহর রসূল মাসীহ 'ঈসা ইবনে মারয়ামকে হত্যা করেছি।) তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল একথা জেনে বুঝেও তারা যদি তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকে তাহলে তা তাদের ঐতিহ্য বিরোধী কোন কাজ নয়। তাদের জনসাধারণ না জানলেও পণ্ডিত-পুরোহিত ও আলেম সমাজ ভাল করেই জানতো যে, তিনি আল্লাহর রসূল। এ বিষয়ের কয়েকটি প্রমাণ কুরআন মজীদেই বর্তমান। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ , টিকা ৭৯-৯৫; সাফ্ফাত, টীকা ৭০-৭৩।

আল্লাহ তা'আলার তাদের ওপর চড়াও হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি অন্য কোন স্থানে ছিলেন সেখান থেকে তাদের ওপর চড়াও হয়েছেন। বরং এটি একটি রূপক বাক্য। এরূপ ধারণা দেয়াই মূলত উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে মোকাবিলার সময় তাদের ধারনা ছিল, শুধু একটি পন্থায় আল্লাহ তাদের ওপর বিপদ আনতে পারেন। তাহলো সামনাসামনি কোন সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসা। আর তারা মনে করতো যে, দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়ে তারা সে বিপদ ঠেকাতে পারবে। কিন্তু এমন একটি পথে তিনি তাদের ওপর হামলা করেছেন, যে দিক থেকে কোন বিপদ আসার আদৌ কোন আশংকা তারা করতো না। সে পথটি ছিল এই যে, ভিতর থেকেই তিনি তাদের মনোবল ও মোকাবিলার ক্ষমতা নিঃশেষ ও অন্তসারশূন্য করে দিলেন । এরপর তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং দুর্গ কোন কাজেই আসেনি।

অর্থাৎ ধ্বংসসাধিত হয়েছে দু'ভাবে। যে দুর্গের মধ্যে তারা আশ্রয় নিয়েছিল। মুসলমানরা বাইরে থেকে অবরোধ করে তা ভেঙ্গে ফেলতে শুরু করলো। আর ভেতর থেকে তারা নিজেরা প্রথমত মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য স্থানে স্থানে কাঠ ও পাথরের প্রতিবন্ধক বসালো এবং সে জন্য নিজেদের ঘর দড়জা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আবর্জনা জমা করলো। এরপর যখন তারা নিশ্চিত বুঝতে পারলো যে, এ জায়গা ছেড়ে তাদেরকে চলে যেতেই হবে তখন তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করতে শুরু করলো

যাতে তা মুসলমানদের কোন কাজে না আসে। অথচ এক সময় বড় শখ করে তারা এসব বাড়ীঘর নির্মাণ করে সাজিয়ে গুছিয়েছিল। এরপর তারা যখন এই শর্তে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধি করলো যে, তাদের প্রাণে বধ করা হবে না এবং অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর যাই তারা নিয়ে যেতে সক্ষম হবে নিয়ে যেতে পারবে তখন যাওয়ার বেলায় তারা ঘরের দরজা, জানালা এবং খুঁটি পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। এমনকি অনেকে ঘরের কড়িকাঠ এবং কাঠের চাল পর্যন্ত উঠের পিঠে তুলে দিল। এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের কয়েকটি দিক আছে। সংক্ষিপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ এই আয়াতাংশে সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। এই ইহুদীরা মূলত অতীত নবীদেরই উম্মাত ছিল। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, কিতাব বিশ্বাস করতো, পূর্ববর্তী নবীদের বিশ্বাস করতো এবং আখেরাত বিশ্বাস করতো। এসব বিচারে তারা ছিল মূলত সাবেক মুসলমান। কিন্তু তারা যখন দীন ও আখলাককে উপেক্ষা করে শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির লালসা এবং পার্থিব উদ্দেশ্য ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য স্পষ্ট ও খোলাখুলীভাবে ন্যায় ও সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণের নীতি অবলম্বন করলো এবং নিজেদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির কোন তোয়াক্কাই করলো না তখন আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ -দৃষ্টিও আর তাদের প্রতি রইলো না। তা না হলে একথা সবারই জানা যে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। তাই এই পরিণাম দেখিয়ে সর্বপ্রথম মুসলমানদের উপদেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যেন ইহুদীদের মত তারাও নিজেদেরকে খোদার প্রিয়পাত্র ও আদরের সন্তান মনে করে না বসে এবং এই খামখেয়ালীতে মগ্ন না হয় যে, আল্লাহর শেষ নবীর উম্মত হওয়াটাই তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভের গ্যারান্টি। এর বাইরে দীন ও আখলাকের কোন দাবী পূরণ তাদের জন্য জরুরী নয়। সাথে সাথে গোটা দুনিয়ার সেই সব লোককেও এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যারা জেনে বুঝে সত্যের বিরোধিতা করে এবং নিজেদের সম্পদ ও শক্তি এবং উপায়-উপকরণের উপর এতটা নির্ভর করে যে, মনে করে তা তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। মদীনার ইহুদীদের একথা অজানা ছিল না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কওম বা গোত্রের মান মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন না। বরং তিনি একটি আদর্শিক দাওয়াত পেশ করেছেন। এ দাওয়াতের লক্ষ গোটা দুনিয়ার সব মানুষ। এ দাওয়াত গ্রহণ করে যে কোন জাতি, গোষ্ঠি ও দেশের মানুষ কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই তাঁর উম্মাত হিসেবে গন্য হতে পারে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজ খান্দানের লোকজনের মুসলিম সামাজে যে মর্যাদা ছিল হাবশার বেলাল (রা) , রোমের সুহাইব (রা) এবং পরস্যের সালমানের (রা) ও সেই একই মর্যাদা ছিল, এটা তারা নিজ চোখে দেখছিল। তাই কুরাইশ, খাযরাজ ও আওস গোত্রের লোকেরা তাদের ওপর আধিপত্য কায়েম করবে এ আশংকা তাদের সামনে ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আদর্শিক দাওয়াত পেশ করেছিলেন তা যে অবিকল সেই দাওয়াত যা তাদের নবী-রসূলগণ পেশ করে এসেছেন, এ বিষয়টিও তাদের অজানা ছিল না। এ দাবীও তো তিনি করেননি যে, তিনি নতুন একটি দীন নিয়ে এসেছেন যা ইতিপূর্বে আর কেউ আনেনি। এখন তোমরা নিজেদের দীন বা জীবন

ব্যবস্থা ছেড়ে আমার এই দীন বা আদর্শ গ্রহণ করো। বরং তাঁর দাবী ছিল, এটা যে সেই একই দীন, সৃষ্টির শুরু থেকে আল্লাহর নবী-রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন। প্রকৃতই এটা যে সেই দীন তার সত্যতা তারা তাওরাত থেকে প্রমাণ করতে পারতো। এর মৌল নীতিমালার সাথে নবী-রসূলের দীনের মৌল নীতিমালার কোন পার্থক্য নেই। এ কারণেই কুরআন মজীদে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছেঃ (তোমরা ঈমান আনো আমার নাযিলকৃত সেই শিক্ষার ওপরে যা তোমাদের কাছে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান শিক্ষার সত্যায়নকারী। সবার আগে তোমরাই তার অস্বীকারকারী হয়ো না) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন চরিত্র ও আখলাকের লোক। তাঁর দাওয়াত কবুল করে মানুষের জীবনে কেমন সর্বাত্মক বিপ্লব সাধিত হয়েছে তা তারা চাক্ষুষ দেখছিল। আনসারগণ দীর্ঘদিন থেকে তাদের নিটক প্রতিবেশী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের অবস্থা যা ছিল তাও তারা দেখেছে। আর এখন ইসলাম গ্রহণের পর তাদের যে অবস্থা হয়েছে তাও তাদের সামনে বর্তমান। এভাবে দাওয়াত, দাওয়াতদাতা ও দাওয়াত গ্রহণকারীদের পরিণাম ও ফলাফল সবই তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল। এসব দেখে এবং জেনে বুঝেও তারা শুধু নিজেদের বংশগত গোঁড়ামি এবং পার্থিব স্বার্থের খাতিরে এমন একটি জিনিসের সন্দেহ করার কোন অবকাশ অন্তত তাদের জন্য ছিল না। এই সজ্ঞান শত্রুতার পরেও তারা আশা করতো, তাদের দুর্গ তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। অথচ গোটা মানব ইতিহাস, একথার সাক্ষী যে, আল্লাহর শক্তি যার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয় কোন অস্ত্রই তাকে রক্ষা করতে পারে না।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৫১

সূরা আল হাশর (৫৯) আয়াত ০৫

তোমরা খেজুরের যে গাছগুলো কেটেছ আর যেগুলোকে তাদের মূলকান্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই (করেছ)। আর (এ অনুমতি আল্লাহ এজন্য দিয়েছেন) যেন তিনি পাপাচারীদেরকে অপমানিত করেন।

তাফসীর বলে

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। **মুসলমানরা অবরোধ শুরু করার পর তা সহজসাধ্য করার জন্য বনী নাযীরের বসতির চারদিকে যে খেজুর বাগান ছিল তার অনেক গাছ কেটে ফেলে কিংবা জ্বালিয়ে দেয়।** আর যেসব গাছ সামরিক বাহিনীর চলাচলে প্রতিবন্ধক ছিল না সেগুলোকে যথাস্থানে অক্ষত রাখে। এতে মদীনার মুনাফিকরা ও বনী কুরায়যা এমনকি বনী নাযীর গোত্রের লোকও হৈ চৈ করতে শুরু করলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "ফাসাদ ফিল আরদ" বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন; কিন্তু দেখো, তরুতাজা শ্যামল ফলবান গাছ কাটা হচ্ছে। এটি কি

"ফাসাদ ফিল আরদ" নয়। এই সময় আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ নাযিল করেলেনঃ "তোমরা যেসব গাছ কেটেছো এবং যা না কেটে অক্ষত রেখেছো এর কোন একটি কাজও নাজায়েয নয়। বরং এ উভয় কাজেই আল্লাহর সম্মতি রয়েছে। **"এ থেকে শরীয়াতের এ বিধানটি পাওয়া যায় যে, সামরিক প্রয়োজনে যেসব ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর তৎপরতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তা "ফাসাদ ফিল আরদ" বা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টির সংজ্ঞায় পড়ে না।** "ফাসাদ ফিল আরদ" হলো কোন সেনাবাহিনীর মাথায় যদি যুদ্ধের ভূত চেপে বসে এবং তারা শত্রুর দেশে প্রবেশ করে শস্যক্ষেত, গবাদি পশু, বাগান, দালানকোঠা, প্রতিটি জিনিসই নির্বিচারে ধ্বংস ও বরবাদ করতে থাকে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক সিরিয়ায় সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় যে নির্দেশ দিয়েছিলেন যুদ্ধের ব্যাপারে সেটিই সাধারণ বিধান। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, ফসল ধ্বংস করবে না এবং তিনি জনবসতি বিরাণ করবে না। কুরআন মজীদে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মানুষদের নিন্দা ও সমালোচনা করতে গিয়ে এ কাজের জন্য তাদের তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করে বলা হয়েছেঃ "যখন তারা ক্ষমতাসীন হয় তখন শস্যক্ষেত ও মানব বংশ ধ্বংস করে চলে।" (বাকারাহ, ২০৫) হযরত আবু বকরের (রা) এ নীতি ছিল কুরআনের এ শিক্ষারই হুবহু অনুসরণ। তবে **সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলে বিশেষ নির্দেশ হলো, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের জন্যকোন ধ্বংসাত্মক কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়লে তা করা যেতে পারে।** তাই হযতর আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, "মুসলমানগণ বনী নাযীরের গাছপালার মধ্যে কেবল সেই সব গাছপালাই কেটেছিলেন যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল।" (তাফসীরে নায়শাপুরী) ফকীহদের কেউ কেউ ব্যাপারটির এ দিকটার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে মত পেশ করেছেন যে, বনী নাযীরের বৃক্ষ কাটার বৈধতা শুধু এ ঘটনার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। এ থেকে এরূপ সাধারণ বৈধতা পাওয়া যায় না যে, সামারিক প্রয়োজন দেখা দিলেই শত্রুর গাছপালা কেটে ফেলা এবং জ্বালিয়ে দেয়া যাবে। ইমাম আওযায়ী, লাইস ও আবু সাওর এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। তবে অধিকাংশ ফকীহর মত হলো, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলে এরূপ করা জায়েজ। তবে শুধু ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য এরূপ করা জায়েজ নয়। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কুরআন মজীদের এ আয়াত মুসলমানদের হয়তো সন্তুষ্ট করে থাকতে পারে কিন্তু কুরআনকে আল্লাহর বানী বলে স্বীকার করতো না নিজেদের প্রশ্নের এ জবাব শুনে তরা কি সান্ত্বনা লাভ করবে যে, এ দুটি কাজই আল্লাহর অনুমতির ভিত্তিতে বৈধ। **এর জবাব হলো শুধু মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কাফেরদের সন্তুষ্ট করা এর আদৌ কোন উদ্দেশ্য নয়।** যেহেতু ইহুদী ও মুনাফিকদের প্রশ্ন সৃষ্টির কারণে কিংবা মুসলমানদের মনে স্বতস্ফূর্তভাবে সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল আমরা "ফাসাদ ফীল আরদে" লিপ্ত হয়ে পড়ি নাই তো। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সন্ত্বনা দিলেন যে, অবরোধের প্রয়োজনে কিছু সংখ্যক গাছপালা কেটে ফেলা এবং অবরোধের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না এমন সব গাছপালা না কাটা এ দুটি কাজই আল্লাহর বিধান অনুসারে বৈধ ছিল।

এসব গাছ কেটে ফেলা বা জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই দিয়েছিলেন না মুসলমানরা নিজেরাই এ কাজ করে পরে এর শরয়ী বিধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন সে বিষয়ে মুহাদ্দিসদের বর্ণিত হাদীসসমূহে মতানৈক্য দেখা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'উমরের বর্ণনা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে জারীর)। ইয়াযীদ ইবনে রূমানের বর্ণনাও তাই। (ইবনে জারীর) অন্যদিকে মুজাহিদ ও কাতাদার বর্ণনা হলো, এসব গাছপালা মুসলমানরা নিজেদের সিদ্ধান্তেই কেটেছিলেন। তারপর এ বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় যে, কাজটি করা উচিত হয়েছে কিনা । কেউ কেউ তা বৈধ বলে মত প্রকাশ করলেন। আবার কেউ কেউ এরূপ করতে নিষেধ করলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে উভয় দলের কাজেই সঠিক বলে ঘোষণা করলেন। (ইবনে জারীর) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ রেওয়ায়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেনঃ এ বিষয়ে মুসলমানদের মনে সংশং সৃষ্টি হয় যে, আমাদের মধ্যে থেকে অনেকে গাছপালা কেটেছে আবার অনেকে কাটেনি। অতএব এখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা উচিত, আমাদের কার কজ পুরস্কার লাভের যোগ্য আর কার কাজ পাকড়াও হওয়ার যোগ্য । (নাসায়ী) ফকীহদের মধ্যে যারা প্রথম রেওয়ায়াতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা এ রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ করেন যে, এটি ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজতিহাদ। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট অহী দ্বারা তা সমর্থন ও সত্যায়ন করেছেন। এটা এ বিষয়ের একটা প্রমাণ যে, যেসব ব্যাপারে আল্লাহর কোন নির্দেশ বর্তমান থাকতো না সে সব ব্যাপারে নবী (সা) ইজতিহাদ করে কাজ করতেন। অপরপক্ষে যেসব ফকীহ দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা এ থেকে প্রমাণ পেশ করেন যে, মুসলমানদের দুটি দল ইজতিহাদের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দুটি মত গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দুটি মতই সমর্থন করেছেন। অতএব জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ যদি সৎনিয়তে ইজতিহাদ করে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন তবে তাদের মতসমূহ পরস্পর ভিন্ন হবে। কিন্তু আল্লাহর শরীয়াতে তারা সবাই হকের অনুসারী বলে গণ্য হবেন।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল এসব গাছ কাটার দ্বারাও তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হোক এবং না কাটা দ্বারাও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হোক। **কাটার মধ্যে তাদের অপমান ও লাঞ্ছনার দিকটা ছিল এই যে, যে বাগান তারা নিজ হাতে তৈরী করেছিল এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তারা যে বাগানের মালিক ছিল সেই সব বাগানের গাছপালা তাদের চোখের সামনেই কেটে ফেলা হচ্ছে।** কিন্তু তারা কোনভাবে কর্তনকারীদের বাধা দিতে পারছে না। একজন সাধারণ কৃষক বা মালিও তার ফসল বা বাগানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বরদাশত করতে পারে না। কেউ যদি তার সামনে তার ফসল বা বাগান ধ্বংস করতে থাকে তাহলে সে তার বিরুদ্ধে প্রাণপাত করবে। সে যদি নিজের সম্পদে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে না পারে তবে তা হবে তার চরম অপমান ও দুর্বলতার প্রমাণ। **কিন্তু এখানে পুরা একটি গোত্র যারা শত শত বছর**

ধরে এ স্থানে বসবাস করে আসছিলো অসহায় হয়ে দেখছিলো যে, তাদের প্রতিবেশী তাদের বাগানের ওপর চড়াও হয়ে এর গাছপালা ধ্বংস করছে। কিন্তু তারা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি। এ ঘটনার পর তারা মদীনায় থেকে গেলেও তাদের কোন মান-মর্যাদা অবশিষ্ট থাকতো না। এখন থাকলো গাছপালা না কাটার মধ্যে অপমান ও লাঞ্ছনার বিষয়টি। সেটি হলো, যখন তারা মদীনা ছেড়ে চলে যাচ্ছিলো তখন নিজ চোখে দেখছিল যে, **শ্যামল-সবুজ যেসব বাগান কাল পর্যন্ত তাদের মালিকানায় ছিল আজ তা মুসলমানদের দখলে চলে যাচ্ছে।** ক্ষমতায় কুলালে তারা ওগুলো পুরোপুরি ধ্বংস করে যেতো এবং অবিকৃত একটি গাছও মুসলমানদের দখলে যেতে দিতো না। কিন্তু তারা নিরূপায়ভাবে সবকিছু যেমন ছিল তেমন রেখে হতাশা ও দুঃখ ভরা মনে বেরিয়ে গেল।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৫২

সূরা আল হাশর (৫৯) আয়াত ০৬

আল্লাহ তাঁর রসূলকে তাদের কাছ থেকে যে ফায় (বিনা যুদ্ধে পাওয়া সম্পদ) দিয়েছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়াও দৌড়াওনি, আর উটেও চড়নি, বরং আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে যার উপর ইচ্ছে আধিপত্য দান করেন; আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

তাফসীর বলে

যেসব বিষয় সম্পত্তি বনী নাযীরের মালিকানায় ছিল এবং তাদের বহিষ্কারের পর তা ইসলামী সরকারের হস্তগত হয়েছিলো এখানে সেই সব বিষয় সম্পত্তির কথা বলা হচ্ছে। এসব সম্পদের ব্যবস্থাপনা কিভাবে করা যাবে এখান থেকে শুরু করে ১০নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সেই সব কথাই বলেছেন। কোন এলাকা বিজিত হয়ে ইসলামী সরকারের দখলভুক্ত হওয়ার ঘটনা যেহেতু এটাই প্রথম এবং পরে আরো এলাকা বিজিত হতে যাচ্ছিলো তাই এ জন্য বিজয়ের শুরুতেই বিজিত ভূমি সম্পর্কে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভেবে দেখার মত বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা (যে সম্পদ তাদের দখলমুক্ত করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন) বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। এ বাক্য থেকে স্বতঃই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, এই পৃথিবী এবং যেসব জিনিস এখানে পাওয়া যায় তাতে সেই সব লোকদের মূলত কোন অধিকার নেই যারা মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। তারা যদি এর ওপরে দখলকারী ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেও থাকে তাহলেও তার অবস্থা হলো বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য কর্তৃক মনিবের বিষয়-সম্পদ কুক্ষিগত করার মত। প্রকৃতপক্ষে এসব সম্পদের হক হলো তা তার আসল মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মর্জি অনুসারে তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করা আর এভাবে ব্যবহার কেবল নেককার ঈমানদার বান্দারাই করতে পারে। তাই বৈধ ও ন্যায়সংগত যুদ্ধের পরিণতিতে যেসব সম্পদ কাফেরদের

দখলমুক্ত হয়ে ঈমানদারদের করায়ত্ত হবে তার মর্যাদা হলো তার মালিক এ সম্পদ নিজের বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যদের দখল থেকে উদ্ধার করে তাঁর আনুগত্য ভৃত্যদের দখলে দিয়েছেন। তাই ইসলামী আইনের পরিভাষায় এসব বিষয় সম্পদকে 'ফাই' (প্রত্যাবর্তিত বা ফিরিয়ে আনা সম্পদ) বলা হয়েছে।

অর্থাৎ এসব সম্পদের অবস্থা ও প্রকৃতি এমন নয় যে, সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে লড়াই করে তা অর্জন করেছে। তাই এতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ সম্পদ তাদের মধ্যেই বন্টন করে দিতে হবে। বরং তার প্রকৃত অবস্থা হলো, আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে তাঁর রসূলের এবং যে আদর্শের প্রতিনিধিত্ব এ রসূল করেছেন সেই আদর্শকে তাদের ওপর বিজয় দান করেছেন। অন্য কথায়, এসব সম্পদ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হওয়া সরাসরি সেনাবাহীনির শক্তি প্রয়োগের ফল নয়। বরং এটা সেই সামগ্রিক শক্তির ফল যা আল্লাহ তাঁর রসূল, রসূলের উম্মাত, এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে দান করেছেন। তাই এসব সম্পদ গনীমাতের সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন। **এতে যুদ্ধরত সৈনিকদের এমন কোন অধিকার বর্তায় না যে, তা তাদের মধ্যে গনীমাতের মত বন্টন করে দিতে হবে। এভাবে শরীয়াতে 'গনীমাত'ও 'ফাই'-এর আলাদা আলাদা বিধান দেয়া হয়েছে।** সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে গনীমাতের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। বিধানটি হলো, গনীমাতের সম্পদ পাঁচটি অংশে ভাগ করা হবে। এর চারটি অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে এবং একটি অংশ বায়তুলমালে জমা দিয়ে উক্ত আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহে খরচ করতে হবে। ফাইয়ের বিধান হলো, তা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। বরং এর সবটাই পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। এই দুই ধরনের সম্পদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করা হয়েছেঃ **(তোমরা তার বিরুদ্ধে নিজেদের ঘোড়া বা উট পরিচালনা কর নাই) কথাটি দ্বারা ঘোড়া বা উট পরিচালনা করার অর্থ সামরিক তৎপরতা চালানো (Warlike Operations)। সুতরাং সরাসরি এ ধরনের তৎপরতার ফলে যেসব সম্পদ হস্তগত হয়ে থাকে তা গনীমাতের সম্পদ। আর যেসব সম্পদ লাভের পেছনে এ ধরনের তৎপরতা নেই তা সবই 'ফাই' হিসেবে গণ্য।**

'গনীমাত' ও 'ফাই' এর মোটামুটি যে অর্থ এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামের ফকীহগণ তা আরো স্পস্ট করে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ গণীমাত হলো সেই সব অস্থাবর সম্পদ যা সামরিক তৎপরতা চালানোর সময় শত্রু সেনাদের নিকট থেকে লাভ করা গিয়েছে। এসব ছাড়া শত্রু এলাকার ভূমি, ঘরবাড়ী, এবং অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ গনীমাতের সংজ্ঞায় পড়ে না। এ ব্যাখ্যার উৎস হলো হযরত উমরের (রা) সেই পত্র যা তিনি ইরাক বিজয়ের পর হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছেনঃ

"সেনাবাহিনীর লোকজন যেসব ধন-সম্পদ তোমাদের কাছে কুড়িয়ে আনবে তা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আর ভূমি ও সেচ খালে যেসব লোক কাজ করে ভূমি ও সেচ খাল তাদের জন্য রেখে দাও যাতে তার আয় মুসলমানদের বেতন ভাতা ও বৃত্তি দেয়ার কাজে লাগে।"

(কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসূফ, পৃষ্ঠা ২৪; কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ, পৃষ্ঠা ৫৯; কিতাবুল খারাজ, ইয়াহইয়া ইবনে আদম, পৃষ্ঠা ২৭, ২৮ ৪৮)

এ কারণে হাসান বসরী বলেনঃ শত্রুর শিবির থেকে যা হস্তগত হবে তা সেই সব সৈন্যদের হক যারা তা দখল করেছে। কিন্তু ভূমি সব মুসলমানদের জন্য। (ইয়াহইয়া ইবনে আদম ২৭) ইমাম আবু ইউসূফ বলেনঃ "শত্রুসেনাদের কাছ থেকে যেসব জিনিস মুসলমানদের হস্তগত হবে এবং যেসব দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র ও জীবজন্তু তারা কুড়িয়ে ক্যাম্পে আনবে তাহলো গনীমাত। এর মধ্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে রেখে অবশিষ্ট চার অংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে। " (কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ১৮) ইয়াহইয়া ইবনে আদমও এ মত পোষণ করেন এবং তা তিনি তাঁর গ্রন্থ কিতাবুল খারাজে বর্ণনা করেছেন। (পৃষ্ঠা ২৭) যে জিনিসটি 'গনীমাতের ও ফাই' এ পার্থক্য আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরে তা হলো, নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে শেষে গনীমাতের সম্পদ বন্টন এবং বিজিত এলাকা যথারীতি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হওয়ার পর সায়েব ইবনে আকরা, নামক এক ব্যক্তি দুর্গের অভ্যন্তরে দুটি থলী ভর্তি মণি মুক্তা কুড়িয়ে পান। এতে তার মনে খটকা সৃষ্টি হয় যে, তা 'গনীমাত'না 'ফাই'। গনিমাত হলে তা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে। আর 'ফাই' হলে তা বায়তুলমালে জমা হওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত তিনি মদীনায় হাজির হলেন এবং বিষয়টি হযরত উমরের (রা) সামনে পেশ করলেন। হযরত উমর (রা) ফায়সালা করলেন যে, তা বিক্রি করে অর্থ বায়তুলমালে জমা দিতে হবে। এ থেকে জানা গেল যে, শুধু এমন সব অস্থাবর সম্পদ গনীমাত হিসেবে গণ্য হবে যা যুদ্ধের সময় সৈন্যদের হস্তগত হবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পদ স্থাবর সম্পদের মতই 'ফাই' হিসেবে গণ্য হয়। এ ঘটনাটি উল্লেখ করে ইমাম আবু উবায়েদ লিখছেনঃ

"যুদ্ধ চলাকালে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যেসব সম্পদ শত্রুর কাছ থেকে হস্তগত হবে তা গনীমাত। আর যুদ্ধ শেষে দেশ দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হওয়ার পর যেসব সম্পদ হস্তগত হবে তা 'ফাই' হিসেবে পরিগণিত হবে। এ সম্পদ দারুল ইসলামের অধিবাসীদের কল্যাণ কাজে লাগা উচিত। তাতে এক-পঞ্চমাংশ নির্দিষ্ট হবে না। " (কিতাবুল আমওয়াল, পৃষ্ঠা ২৫৪)

গনীমাতকে এভাবে সংজ্ঞায়িত ও নির্দিষ্ট করার পর কাফেরদের কাছ থেকে মুসলমানদের হস্তগত হওয়া যেসব সম্পদ, বিষয়-সম্পত্তি ও জায়গা-জমি অবশিষ্ট থাকে তা প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, লড়াই করে হস্তগত করা সম্পদ ইসলামী ফিকাহের পরিভাষায় যাকে শক্তি বলে দখলকৃত দেশ বা অঞ্চল বলা হয়। দুই, সন্ধির ফলে যা মুসলমানদের হস্তগত হবে। এ সন্ধি মুসলমানদের সামরিক শক্তির প্রভাব, দাপট কিংবা ভীতির কারণে হলেও। বাহুবলে হস্তগত না হয়ে অন্য কোনভাবে হস্তগত হওয়া সম্পদও এরই মধ্যে অন্তরভুক্ত। মুসলিম ফকীহদের মধ্যে যা কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা প্রথম প্রকারের সম্পদ সম্পর্কে হয়েছে। অর্থাৎ তার সঠিক শরয়ী মর্যাদা কি। কেননা, তা -এর সংজ্ঞায় পড়ে না। এরপর থাকে দ্বিতীয় প্রকার সম্পদ। এ প্রকারের সম্পদ সম্পর্কে সর্বসম্মত মত হলো, তা 'ফাই'হিসেবে গণ্য।

কারণ এর বিধান কুরআন মজিদে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। পরে আমরা প্রথম প্রকারের সম্পদের শরয়ী মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৫৩

সূরা আল হাশর (৫৯) আয়াত ০৭

যে ধন-সম্পদ আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রসূলকে দিলেন তা আল্লাহর জন্য তাঁর রসূলের জন্য আর রসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য যাতে তা তোমাদের মধ্যকার সম্পদশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যাথেকে নিষেধ করে তাথেকে বিরত থাক, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

তাফসীর বলে

এসব সম্পদ আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর মধ্যে গনীমাতের মত বন্টন না করার কারণ কি এবং তার শরয়ী বিধান গনিমাতের সম্পর্কিত বিধান থেকে ভিন্ন কেন পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু এতটুকু কথাই বলা হয়েছে। এখন এসব সম্পদের হকদার কারা এ আয়াতটিতে তা বলা হয়েছে।

এসব সম্পদের মধ্যে সর্বপ্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের। রসূলুল্লাহ (সা) এ নির্দেশ অনুসারে যেভাবে আমল করেছেন হযরত উমর (রা) থেকে মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাসান তা উদ্ধৃত করেছেন। **হযরত উমর (রা) বলেনঃ এ অংশ থেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের ও পরিবার-পরিজনের খরচ নিয়ে নিতেন আর অবশিষ্ট অর্থ জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সাওয়ারী জন্তু সংগ্রহ করতে ব্যয় করতেন**। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইত্যাদি)

নবীর (সা) ইন্তিকালের পর এ অংশটি মুসলমানদের বায়তুলমালে জমা দেয়া হতো যাতে আল্লাহ তাঁর রসূলকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই কাজেই তা ব্যয়িত হয়। ইমাম শাফেয়ীর (র) মত হলো, যে অংশটি বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল তা তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর খলিফাদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। কারণ ইমামত বা নেতৃত্বের পদমর্যাদার জন্য তিনি এর হকদার ছিলেন, রিসালাতের পদমর্যাদার জন্য নয়। তবে শাফেয়ী ফিকাহবিদগণের অধিকাংশ এ ব্যাপারে অন্যান্য অধিকাংশ ফিকাহবিদগণের অনুরূপ মতামত পোষণ করেন। অর্থাৎ এ অংশটি এখন আর কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং তা মুসলমানদের দীনি ও সামাজিক কল্যাণে ব্যয়িত হবে।

দ্বিতীয় অংশটি হলো আত্মীয়-স্বজনের জন্য। এর অর্থ রসূলের আত্মীয়-স্বজনের জন্য। অর্থাৎ বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব। এ অংশটি নির্ধারিত করা হয়েছিল। এ জন্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম যেন নিজের এবং নিজের পরিবার-পরিজনের হক আদায় করার সাথে সাথে নিজের সেই সব আত্মীয়-স্বজনের হকও আদায় করতে পারেন যারা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী অথবা তিনি নিজে যাদের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর এ অংশের ও ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র মর্যদা অবশিষ্ট নেই। বরং মুসলমানেদর অন্য সব মিসকীন, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের মত বনী হাশেমও বনী মুত্তালিবের অভাবী লোকদের অধিকারসমূহ ও বায়তুলমালের জিম্মাদারীতে চলে গিয়েছে। তবে যাকাতে তাদের অংশ না থাকার কারণে অন্যদের তুলানায় তাদের অধিকার অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর, উমর, ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যুগে প্রথম দুটি অংশ বাতিল করে শুধু অবশিষ্ট তিনটি অংশের (ইয়াতীম, মিসকীন ও ইবনুস সাবীল) হকদারদের জন্য 'ফাই' নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁর যুগে এ নীতি অনুসারে আমল করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইমাম মুহাম্মাদ বাকেরের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, যদিও হযরত আলীর (রা) আহলে বায়তের রায়ই। [এ অংশ নবীর (সা) আত্মীয়-স্বজনের পাওয়া উচিত] তাঁর ব্যক্তিগত রায় ছিল। তথাপি তিনি হযরত আবু বকর ও উমরের (রা) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করা পছন্দ করেননি। হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া বলেনঃ নবীর (সা) পরে ঐ দুটি অংশ (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ ও যাবিল কুরবর অংশ) সম্পর্কে মাতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু সংখ্যক লোকের মত ছিল, প্রথম অংশটি হুজরের (সা) খলীফার প্রাপ্য। কিছু সংখ্যক লোকের মত ছিল, দ্বিতীয় অংশ হুজুরের (সা) আত্মীয়-স্বজনের পাওয়া উচিত। অপর কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা ছিল, দ্বিতীয় অংশটি খলীফার আত্মীয়-স্বজনের দেয়া উচিত। অবশেষে এ মতে 'ইজমা' বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো যে, এ দুটি অংশই জিহাদের প্রয়োজনে খরচ করা হবে। আতা ইবনে সায়েব বলেনঃ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁর শাসনকালে হুজর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের অংশ বনী হাশেমদের কাছে পাঠাতে শুরু করেছিলেন। ইমাম আবু হানীফা এবং অধিকাংশ হানাফী ফকীহদের সিদ্ধান্ত হলো, এ ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে অনুসৃত কর্মনীতিই সঠিক ও নির্ভুল (কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসূফ, পৃষ্ঠা ১৯ থেকে ২১)। ইমাম শাফেয়ীর (র) মত হলো, যারা হাশেম ও মুত্তালিব বংশের লোক বলে প্রমাণিত কিংবা সাধারণভাবে সবার কাছে পরিচিত তাদের সচ্ছল ও অভাবী উভয় শ্রেণীর লোককেই 'ফাই' এর সম্পদ থেকে দেয়া যেতে পারে। (মুগনিউল মুহতাজ) হানাফীদের মতে, এ অর্থ থেকে কেবল তাদের অভাবীদের সাহায্য করা যেতে পারে। অবশ্য অন্যদের তুলনায় তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। (রুহুল মায়ানী) ইমাম মালেকের মতে এ ব্যাপারে সরকারের ওপর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। যে খাতে ইচ্ছা সরকার তা ব্যয় করতে পারেন। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদের অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম। (হাশিয়াতুদ দুসুকী আলাশশারহিল কাবীর)

অবশিষ্ট তিনটি অংশ সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে কোন বিতর্ক নেই। তবে ইমাম শাফেয়ী এবং অন্য তিনজন ইমামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ীর(র) মতে 'ফাই' এর সমস্ত অর্থ-সম্পদ সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগ উপরোক্ত খাতসমূহে এমনভাবে খরচ করা উচিত যেন তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ সাধারণভাবে মুসলমানদের কল্যাণে, পাঁচ ভাগের এক ভাগ বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের জন্য, পাঁচ ভাগের এক ভাগ ইয়াতিমের জন্য, পাঁচ ভাগের এক ভাগ মিসকীনদের জন্য, এবং পাঁচ ভাগের এক ভাগ মুসাফিরদের জন্য ব্যয়িত হয়। অপরদিকে ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমাদ এভাবে বন্টনের পক্ষপাতী নন। তাদের মতে, 'ফাই' এর সমস্ত অর্থ-সম্পদই সাধারণভাবে মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয়িত হবে। (মুগনিউল মুহতাজ)

এটি কুরআন মজীদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারক আয়াতসমূহের একটি। এতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসির একটি মৌলিক নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গোটা সমাজে ব্যবপকভাবে সম্পদ আবর্তীত হতে থাকা উচিত। এমন যেন না হয় অর্থ-সম্পদ কেবল ধনবান ও বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকবে। কিংবা ধনী দিনে দিনে আরো ধনশালী হতে থাকবে আর গরীব দিনে দিনে আরো বেশী গরীব হতে থাকবে। কুরআন মজীদে এ নীতি শুধু বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং এ উদ্দেশ্যে সুদ হারাম করা হয়েছে, যাকাত ফরয করা হয়েছে, গনীমাতের সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন আয়াতে নফল সাদকা ও দান-খয়রাতের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কাফফারা আদায়ের এমন সব পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যার মাধ্যমে সম্পদের প্রবাহ সমাজের দরিদ্র মানুষের দিকে ফিরিয়ে দেয়া যেতে পারে। উত্তরাধিকারের জন্য এমন আইন রচনা করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ যেন ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে, কার্পণ্য ও বখিলীকে নৈতিক বিচারে কঠোরভাবে নিন্দানীয় এবং দানশীলতাকে সর্বোত্তম গুণ বলে প্রশংসা করা হয়েছে আর সচ্ছল শ্রেনীকে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের সম্পদে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে যাকে খয়রাত মনে করে নয় বরং তাদের অধিকার মনে করে আদায় করা উচিত। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটি বড় খাত অর্থাৎ 'ফাই' সম্পর্কে এমন একটি আইন রচনা করা হয়েছে যে, এর একটি অংশ যেন অনিবার্যরূপে সমাজের দরিদ্র শ্রেনীকে সহায়তা দানের জন্য ব্যয়িত হয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত দু'টি একটি যাকাত এবং অন্যটি 'ফাই'। মুসলমানদের নিসাবের অতিরিক্ত পূঁজি, গবাদি পশু, ব্যবসায় পন্য এবং কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য থেকে আদায় করা হয়, আর এর বেশীর ভাগই গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট। **আর 'ফাই' এর মধ্যে জিযিয়া ও ভূমি রাজত্ব সহ সেই সব আয়ও অন্তরভুক্ত যা অমুসলিমদের নিকট থেকে আসে।** এরও বেশীর ভাগ গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা এ বিষয়েরই স্পষ্ট ইংগিত যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে তার আয় ও ব্যয়ের ব্যবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে দেশের গোটা আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যেন ধন-সম্পদের উপায়-উপকরণের ওপর বিত্তবান এবং প্রভাবশালী লোকদের

ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সম্পদের প্রবাহ গরীবদের দিক থেকে ধনীদের দিকে ঘুরে না যায় আর বিত্তশালীদের মধ্যেই যেন আবর্তিত হতে না থাকে।
বর্ণনার ধারাবাহিকতার দিক থেকে এ আয়াতের অর্থ হলো, বনী নাযীর গোত্র থেকে লব্ধ সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপভাবে পরবর্তীকালে লব্ধ 'ফাই'এর সম্পদের বিলি-বন্টের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা কোন প্রকার আপত্তি ও দ্বিধা -দ্বন্দ্ব ছাড়াই মেনে নাও। তিনি যাকে যা দেবেন সে তা গ্রহণ করবে এবং যা কাউকে দেবেন না সে জন্য যেন আপত্তি বা দাবী উত্থাপন না করে। কিন্তু নির্দেশটির ভাষা যেহেতু ব্যাপকতাবোধ, তাই এ নির্দেশ শুধু 'ফাই' সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সীমবদ্ধ নয়। বরং এর অভিপ্রায় হলে, মুসলমান সব ব্যাপারেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করবে। এ অভিপ্রায়কে আরো স্পষ্ট করে দেয় এ বিষয়টি যে, "রসূল তোমাদের যা কিছু দেন" কথাটির বিপরীতে "যা কিছু না দেন" বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে "যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন(নিষেধ করেন) তা থেকে বিরত থাকো। " এ নির্দেশের লক্ষ যদি শুধু 'ফাই' এর সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে আনুগত্য করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হতো তা হলে 'যা দেন' কথাটির বিপরীতে 'যা না দেন' বলা হতো। এ ক্ষেত্রে নিষেধ করা বা বিরত রাখা কথাটির ব্যবহার দ্বারা আপনা থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ নির্দেশের লক্ষ ও উদ্দেশ্য নবীর (সা) আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও একথাটি বলেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেনঃ
"আমি কোন বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দিলে তা যথাসাধ্য পালন করো। আর যে বিষয়ে বিরত থাকতে বলি তা থেকে দূরে থাকো।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি বক্তৃতাকালে বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা অমুক অমুক ফ্যাশনকারীনী মহিলাকে লা'নত করেছেন।" এই বক্তৃতা শুনে এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বললঃ একথা আপনি কোথায় পেয়েছেন। আল্লাহর কিতাবে তো এ বিষয়ে আমি কোথাও দেখি নাই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেনঃ তুমি আল্লাহর কিতাব পড়ে থাকলে একথা অবশ্যই পেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়েছো। সে বললো হাঁ, এ আয়াত তো আমি পড়েছি। হযরত আবদুল্লাহ বললেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, এরূপ কাজে লিপ্ত নারীদের ওপর আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন। মহিলাটি বললোঃ এখন বুঝতে পারলাম। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে ইবনে আবী হাতেম।)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৫৪

সূরা আল হাশর (৫৯) আয়াত ০৮

(আর এ সম্পদ) সে সব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য যাদেরকে তাদের বাড়ীঘর ও সম্পত্তি-সম্পদ থেকে উৎখাত করা হয়েছে। যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে, আর তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। এরাই সত্যবাদী।

তাফসীর বলে

এ কথা দ্বারা সেই সব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা ঐ সময় মক্কা মুয়াযযামা ও আরবের অন্যান্য এলাকা থেকে ইসলাম গ্রহণের কারণে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। বনী নাযীর গোত্রের এলাকা বিজিত হওয়া পর্যন্ত এসব মুহাজিরের জীবন যাপনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেসব অর্থ-সম্পদ এখন হস্তগত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেসব সম্পদ 'ফাই' হিসেবে হস্তগত হবে তাতে সাধারণ মিসকীন, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের সাথে সাথে এসব লোকেরও অধিকার আছে। উক্ত সম্পদ থেকে এমন সব লোকদের সহযোগিতা দেয়া উচিত যারা আল্লাহ, আল্লাহ রসূল এবং তাঁর দীনের জন্য হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছে এবং দারুল ইসলামে চলে এসেছে। এই নির্দেশের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী নাযীরের সম্পদের একটি অংশ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং আনসারগণ যেসব খেজুর বাগান তাদের মুহাজির ভাইদের সাহায্যের জন্য দিয়ে রেখেছিলেন তা তাদের ফিরিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, 'ফাই' এর সম্পদে মুহাজিরদের এ অংশ কেবল সেই যুগের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কিয়ামাত পর্যন্ত যত লোকই মুসলমান হওয়ার কারণে নির্বাসিত হয়ে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে তাদের পুনর্বাসিত করা এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়া উক্ত রাষ্ট্রের ইসলামী সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তরভূক্ত। তাই তার উচিত যাকাত ছাড়া 'ফাই' এর সম্পদও এ খাতে খরচ করা।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৫৫

সূরা আল হাশর (৫৯) আয়াত ১৪

তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ নয়, সুরক্ষিত জনপদে বা দেয়ালের আড়ালে অবস্থান ছাড়া। তাদের নিজেদের মধ্যেই আছে ভীষণ শত্রুতা। তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে কর কিন্তু তাদের অন্তরগুলো ভিন্ন ভিন্ন। এর কারণ এই যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

তাফসীর বলে

এখানে মুনাফিকদের দ্বিতীয় দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। তাদের প্রথম দুর্বলতা হলো, তারা ছিল ভীরু- আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে মানুষকে ভয় করতো। ঈমানদারদের মত তাদের সামনে এমন কোন উন্নত লক্ষ ও আদর্শ ছিল না যা অর্জনের জন্য তাদের মধ্যে প্রাণপণ সংগ্রামে ঝাপায়ে পড়ার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হতো। তাদের দ্বিতীয় দুর্বলত হলো মুনাফিকীর আচরণ ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না যা তাদের কে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মজবুত ও সুসংবদ্ধ দলে পরিণত করতে পারতো। যে বিষয়টি তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল তাহলো, নিজেদের শহরে বহিরাগত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব ও শাসন চলতে দেখে তাদের কলিজা দগ্ধ হচ্ছিলো আর স্বদেশবাসী আনসার কর্তৃক মুহাজিরদের সসম্মানে গ্রহণ করতে দেখে তাদের মন মুখ ভরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। এই হিংসার কারণে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং আশেপাশের ইসলাম বৈরীদের সাথে ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশ করে এই বহিরাগত প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খতম করে দিতে চাইতো। তাদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এই নেতিবাচক উদ্দেশ্য ছাড়া কোন গঠনমূলক জিনিস ছিল না। তাদের প্রত্যেক নেতার আলাদা আলাদা দল ও উপদল ছিল। প্রত্যেকেই নিজের মাতবরী ফলাতে চাইতো। তারা কেউ কারো অকৃত্রিম বন্ধু ছিল না। প্রত্যেকের মনে অন্যদের জন্য এতটা হিংসা-বিদ্বেষ ছিল যে, নিজেদের সাধারণ শত্রুর মোকাবিলায়ও তারা নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা ভুলতে কিংবা একে অপরের মূলোৎপাটন থেকে বিরত থাকতে পারতো না।

আল্লাহ তা'আলা এভাবে বনী নাযীর যুদ্ধের পূর্বেই মুনাফিকদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যালোচনা করে মুসলমানদের জানিয়ে দিলেন যে, তাদের দিক থেকে বাস্তব কোন বিপদের আশংকা নেই। তাই বারবার এ খবর শুনে তোমাদের ঘাবড়ে যাওয়ার আদৌ কোন কারণ নেই যে, তোমরা বনী নাযীরকে অবরোধ করার জন্য যাত্রা করলেই এই মুনাফিক নেতা দুই হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসবে এবং একই সংগে বনী কুরাইযা ও বনী গাতফান গোত্র দুটিকেও তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে উস্কে দেবে। এসবই লম্ফঝম্ফ মাত্র। চরম পরীক্ষা শুরু হতেই এর অন্তসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

অধ্যায়-১৮: সূরা আল মুমতাহানা (৬০)
(নারী, যাকে পরীক্ষা করা হবে)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৫৬

সূরা আল মুমতাহানা (৬০) আয়াত ০৯

আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন যারা তোমাদের সঙ্গে দীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে আর তোমাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তারাই যালিম।

তাফসীর বলে

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সে বিষয়ে লোকের মধ্যে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারত যে, তাদের কাফের হওয়ার কারণেই বুঝি এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই এ আয়াতগুলোতে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের কুফরী এর মূল কারণ নয়। বরং ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের সাথে তাদের শত্রুতা ও নির্যাতনমূলক আচরণই এর মূল কারণ। অতএব, মুসলমানদের উচিত শত্রু কাফের এবং অশত্রু কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য করা, আর যেসব কাফের কখনো তাদের কোন ক্ষতি করেনি তাদের সাথে ইহসান ও অনুগ্রহনের আচরণ করা উচিত। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর এবং তাঁর মায়ের ঘটনাটি এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। হযরত আবু বকরের (রা) এক স্ত্রী কুতাইলা বিনতে আবদূল উয্যা কাফের ছিলেন এবং হিজরতের পর মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভেই হযরত আসমা জন্ম লাভ করেছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মদীনা এবং মক্কার মধ্যে যাতায়াত শুরু হলে তিনি মেয়েকে দেখার জন্য কিছু উপহার সামগ্রী নিয়ে মদীনায় হাজির হলেন। হযরত আসমা (রা) নিজের বর্ননা হলোঃ আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলামঃ আমি কি আমার মায়ের সংগে দেখা করব। আর আমি কি তার সাথে আপনজনের মত সদাচরণও করব। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি তার সাথে আপনজনের মত সদাচরণ কর। (মুসনাদে

আহমাদ, বুখারী, মুসলিম) হযরত আসমার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এ ঘটনাটি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ননা করে বলেছেন, প্রথমে হযরত আসমা মায়ের সাথে সাক্ষাত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। পরে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সা) অনুমতি পাওয়ার পর তিনি তার সাথে দেখা করেছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম) এ থেকে স্বতঃই যে সিদ্ধান্ত লাভ করা যায় তা হলো ইসলামের দুশমন না হলে কাফের পিতা মাতার খেদমত করা এবং কাফের ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা একজন মুসলমানের জন্য সম্পূর্ণরূপে জায়েজ। একইভাবে গরীব ও অসহায় জিম্মিদের জন্য সাদকার অর্থও খরচ করা যেতে পারে। (আহকামুল কুরআন-জাসসা, রুহূল মায়ানি।)

অধ্যায়-১৯: সূরা আস সফ (৬১) (সারবন্দী সৈন্যদল)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৫৭

সূরা আস সফ (৬১) আয়াত ০৪

আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে- যেন তারা সীসা-গলানো প্রাচীর।

তাফসীর বলে

এর দ্বারা প্রথমত জানা গেল যে, কেবল সেই ঈমানদারই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হয় যারা তাঁর পথে মরণপণ করে কাজ করতে এবং বিপদ আপদ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়ত, জানা গেল যে, আল্লাহ যে সেনাদলকে পছন্দ করেন তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। এক, তারা বুঝে শুনে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর পথে লড়াই করবে এবং এমন কোন পথে লড়াই করবে না যা ফী সাবীলিল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহর পথের সংজ্ঞায় পড়ে না। দুই, **তারা বিচ্ছিন্নতা ও শৃঙ্খলাহীনতার শিকার হবে না, বরং মজবুত সংগঠন সুসংহত অবস্থায় কাতারবন্দী বা সুশৃঙ্খল হয়ে লড়াই করবে। তিন, শত্রুর বিরুদ্ধে তার অবস্থা হবে, "সুদৃঢ় দেয়ালের" মত।** এই শেষ গুণটি আবার অর্থের দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক। যুদ্ধের ময়দানে কোন সেনাবাহিনীই ততক্ষণ পর্যন্ত সুদৃঢ় দেয়ালের মত দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী সৃষ্টি না হবেঃ

আকীদা-বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য। এ গুণটিই কোন সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিক অফিসারকে পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ করে।

পরস্পরের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার ওপর আস্থা। প্রকৃতপক্ষে সবাই নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষে নিষ্ঠাবান এবং অসদুদ্দেশ্যে থেকে মুক্ত না হলে এ গুণ সৃষ্টি হতে পারে না। আর এ গুণটি যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে যুদ্ধের মত কঠিন পরীক্ষা কারো কোন দোষ-ত্রুটি গোপন থাকতে দেয় না। আর আস্থা নষ্ট হয়ে গেলে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য পরস্পরের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করে। নৈতিক চরিত্রের একটি উন্নত মান থাকতে হবে। সেনাবাহিনীর অফিসার এবং সাধারণ সৈনিক যদি সেই মানের নীচে চলে যায় তাহলে তাদের মনে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হতে পারে না। তারা পারস্পরিক কোন্দাল ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ থেকেও রক্ষা পেতে পারে না। উদ্দেশ্য ও লক্ষের

প্রতি এমন অনুরাগ ও ভালবাসা এবং তা অর্জনের জন্য এমন দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই যা গোটা বাহিনীর মধ্যে জীবনপাত করার অদম্য আকাংখা সৃষ্টি করে দেবে আর যুদ্ধের ময়দানে তা প্রকৃতই মজবুত দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। **নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বের যে শক্তিশালী সামরিক সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল, যার সাথে সংঘর্ষে বড় বড় শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল** এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী কোন শক্তি যার মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারেনি এ সব গুণ ও বৈশিষ্ট ছিল তার ভিত্তি

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৫৮

সূরা আস সফ (৬১) আয়াত ১১

(তা এই যে) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো আর তোমরা তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর; এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে!

তাফসীর বলে

যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে যখন বলা হয় ঈমান আনো তখন আপনা থেকেই তার অর্থ দাঁড়ায় খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান হও। **ঈমানের মৌখিক দাবীই শুধু করো না, বরং যে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছো তার জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।**

অর্থাৎ এ ব্যবসায় তোমাদের জন্য দুনিয়ার সব ব্যবসায় থেকে অনেক বেশী উত্তম।

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৫৯

সূরা আস সফ (৬১) আয়াত ১৩

আর অন্য আরেকটিও (তিনি তোমাদেরকে দিবেন) যা তোমরা পছন্দ কর (আর তা হল) আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। (হে নবী!) ঈমানদার লোকেদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।

তাফসীর বলে

যদিও পৃথিবীতে বিজয়ী ও সফলতা লাভ করাও একটা বড় নিয়ামত। কিন্তু মু'মিনের নিকট প্রকৃত গুরুত্বের বিষয় এ পৃথিবীর সফলতা নয়, বরং আখেরাতের সফলতা। এ কারণেই দুনিয়ার এই জীবনে যে শুভ ফলাফল অর্জিত হবে তার উল্লেখ পরে করা হয়েছে আর আখেরাতে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে ।

অধ্যায়-২০: সূরা আল মুনাফিকুন (৬৩) (কপট বিশ্বাসীগণ)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৬০

সূরা আল মুনাফিকুন (৬৩) আয়াত ০৪

তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের শারীরিক গঠন তোমাকে চমৎকৃত করে। আর যখন তারা কথা বলে তখন তুমি তাদের কথা আগ্রহ ভরে শুন, অথচ তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মত (দেখন- সুরত, কিন্ত কার্যক্ষেত্রে কিছুই না)। কোন শোরগোল হলেই তারা সেটাকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে (কারণ তাদের অপরাধী মন সব সময়ে শঙ্কিত থাকে- এই বুঝি তাদের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে গেল)। **এরাই শত্রু, কাজেই তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। এদের উপর আছে আল্লাহর গযব,** তাদেরকে কীভাবে (সত্য পথ থেকে) ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে!

তাফসীর বলে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অত্যন্ত সুঠাম দেহী, সুস্থ, সুদর্শন ও বাকপটু ব্যক্তি ছিল। তার সাঙ্গপাঙ্গদের অনেকও তাই ছিল। এরা সবাই ছিল মাদীনার নেতৃস্থানীয় লোক। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে যখন আসতো তখন দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসতো এবং রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা বলতো। তাদের দেহাবয়ব ও চেহারা -আকৃতি দেখে আর কথাবার্তা শুনে কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, সমাজের এসব সম্মানিত লোকেরা চরিত্রের দিক দিয়ে এত নীচ ও জঘন্য হতে পারে।

অর্থাৎ এরা যারা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে তারা মানুষ নয়, বরং কাঠের গুড়ি। তাদেরকে কাষ্ঠখণ্ডের সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়ে ছে যে, নৈতিক চরিত্র মানুষের মূল প্রাণসত্তা, সেই প্রাণসত্তাই তাদের মধ্যে নেই। তারপর তাদেরকে দেয়ালগাত্রে হেলান দিয়ে খাড়া করা কাষ্ঠখন্ডের সাথে তুলনা করে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তা একেবারেই অকেজো, অপদার্থ। কেননা, কাঠ কেবল তখনই

উপকারে আসে যদি তা ছাদে অথবা দরজায় বা আসবাব তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। দেয়াল গাত্রে হেলান দিয়ে রাখা কাষ্ঠখন্ড কোন উপকারেই আসে না।

ছোট্ট এই আয়াতাংশে তাদের অপরাধী বিবেকের চিত্র অংকন করা হয়েছে। ঈমানের বাহ্যিক পর্দার আড়ালে মুনাফিকীর যে খেলা তারা খেলছিল তা নিজেরা যেহেতু ভাল করেই জানতো, তাই সবসময় তারা ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো যে কখনো যেন তাদের অপরাধের গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যায়, অথবা তাদের আচরণের ব্যাপারে ঈমানদারদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়। জনপদের কোন স্থান থেকে কোন বড় আওয়াজ শোনা গেলে অথবা কোথাও কোন শোরগোল উত্থিত হলে তারা ভয়ে জড়ষড় হয়ে যেত এবং মনে করত, আমার দুর্ভাগ্য বোধ হয় এসেই পড়ল।

অন্য কথায় প্রকাশ্য দুশমন তুলনায় ছদ্মবেশী এসব দুশমন অনেক বেশী ভয়ংকর।

অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক চালচলন ও আচার আচরনণ দেখে প্রতারিত হয়ো না। এ ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকো যে, এরা যে কোন সময় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

এটা বদদোয়া নয়, বরং তারা যে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং সে গযব যে অবশ্যই নাযিল হবে-এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তারই ঘোষণা। এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এ বাকাংশটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেননি এবং আরবী বাকরীতি অনুসারে, অভিশাপ ও তিরস্কার অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমাদের নিজস্ব ভাষায় আমরা যেমন বলিঃ ওর সর্বনাশ হোক, কি জঘন্য মানুষ সে। এখানে "সর্বনাশ" শব্দটি দ্বারা তার জঘন্যতার তীব্রতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, বদদোয়া করা নয়।

তাদেরকে ঈমানের পথ থেকে মুনাফিকীর পথে কে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা বলা হয়নি। একথাটি স্পষ্ট করে না বলার কারণে আপনা থেকেই যে অর্থ প্রকাশ পায় তা হলো, তাদের এই এলোপাতাড়ি ও অস্বাভাবিক আচরণের চালিকাশক্তি একটি নয়, বরং বহু সংখ্যক চালিকাশক্তি এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে। তাদের পেছনে এই চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে শয়তান, অসৎ বন্ধু-বান্ধব এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির আকাংখাসমূহ। কারো স্ত্রী, কারো সন্তান-সন্ততি, কারো নিজ গোত্র ও গোষ্ঠীর অসৎলোকজন তাকে এ পথে চলতে বাধ্য করছে। আবার কাউকে তার হিংসা, বিদ্বেষ ও অহমিকা এ পথে তাড়িত করেছে।

অধ্যায়-২১: সূরা আত তাগাবুন (৬৪) (মোহ অপসারণ)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৬১

সূরা আত তাগাবুন (৬৪) আয়াত ১৪

হে মু'মিনগণ! **তোমাদের স্ত্রী আর সন্তানদের মধ্যে কতক তোমাদের শত্রু।** কাজেই তোমরা তাদের হতে সতর্ক হও। তোমরা যদি তাদের প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর, আর তাদেরকে ক্ষমা কর, তাহলে (তোমাদের সে কাজ হবে আল্লাহর নিকট পছন্দীয় কারণ) আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।

তাফসীর বলে

এ আয়াতের দুটি অর্থ। একটি অর্থ অনুসারে আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে বহুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষকে তাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে, স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের পক্ষ থেকে এবং পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে যেসব কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় সেই সব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এ আয়াতটি প্রযোজ্য। ঈমান ও সত্য সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে একে অপরের পুরোপুরি বন্ধু ও সহযোগী হতে পারে একজন স্বামীর এরূপ স্ত্রী, একজন স্ত্রীর এরূপ স্বামী লাভ করা এবং আকীদা-বিশ্বাস, আমল -আখলাক ও চরিত্রের দিক দিয়ে সকল সন্তান-সন্ততিই চোখ জুড়ানোর মত হওয়া, পৃথিবীতে খুব কমই ঘটে থাকে। বরং সাধারণত দেখা যায় যে, স্বামী যদি নেক্কার ও ঈমানদার হয় তাহলে সে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি লাভ করে থাকে যারা তার দীনদারী, আমানতদারী এবং সততাকে নিজদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করে। তারা চায় যে, তাদের স্বামী ও পিতা তাদের জন্য জাহান্নাম খরিদ করুক এবং হালাল ও হারামের বাছবিচার না করে যে কোন পন্থায় আরাম-আয়েশ, আমোদ-ফূর্তি এবং গোনাহ ও পাপের উপকরণ এনে দিক। কোন কোন সময় আবার এর ঠিক উল্টোটাও ঘটে থাকে। একজন নেক্কার ঈমানদার নারীকে এমন স্বামীর পাল্লায় পড়তে হয় যে স্ত্রীর শরীয়াত অনুসারে জীবন যাপন দুই চোখে দেখতে পারে না। আর সন্তানরাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের গোমরাহী ও দুষ্কর্ম দ্বারা মায়ের জীবনকে অতিষ্ট করে তোলে। বিশেষ করে কুফর ও ঈমানের দ্বন্দ্ব -সংঘাতের সময় যখন একজন মানুষের ঈমান দাবী করে যে, আল্লাহ এবং তাঁর দীনের জন্য সেই ক্ষতি স্বীকার করবে, দেশ ছেড়ে হিজরাত করবে কিংবা

জিহাদে অংশগ্রহণ করে নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করবে তখন তার পথে তার স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনই সর্বপ্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সময় বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের জন্য যে বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছিল এবং কোন অমুসলিম সমাজে ইসলাম গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তির জন্য আজও দেখা দেয় এ আয়াতটির দ্বিতীয় অর্থটি সেই বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। সেই সময় মক্কা মুয়াযযাম ও আরবের অন্যান্য অংশে সাধারণভাবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতো যে, একজন লোক ঈমান এনেছে কিন্তু তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ঈমান আনতে প্রস্তুত নয় শুধু তাই না বরং তারা তাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সচেষ্ট। যেসব মেয়েরা তাদের পরিবারে একাকী ইসলাম গ্রহণ করত। তাদের জন্যও ঠিক একই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো।

যেসব ঈমানদার নারী ও পুরুষ এ দুটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন তাদের উদ্দেশ্য করে তিনটি কথা বলা হয়েছেঃ

সর্বপ্রথম তাদের এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, পার্থিব সম্পর্কের দিক দিয়ে যদিও তারা মানুষের অতি প্রিয়জন কিন্তু দীন ও আদর্শের দিক দিয়ে এরা তোমাদের 'দুশমন'। তারা তোমাদের সৎকাজে বাধা দেয় এবং অসৎকাজের প্রতি আকৃষ্ট করে, কিংবা তোমাদের ঈমানের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং কুফরীর পথে সহযোগীতা করে কিংবা তারা কাফেরদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে মুসলমানদের সামরিক গোপণ তথ্য সম্পর্কে তারা তোমাদের নিকট থেকে যাই জানতে পারে তা ইসলামের শত্রুদের কাছে পৌছিয়ে দেয়। এর যে কোন পন্থায়ই তারা দুশমনী করুক না কেন তাদের দুশমনীর ধরন ও প্রকৃতিতে অবশ্যই পার্থক্য হয়। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই তা দুশমনী। ঈমান যদি তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে সেই বিচারে তাদেরকে দুশমনই মনে করতে হবে। তাদের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে এ বিষয়টি কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তোমাদের ও তাদের মধ্যে ঈমান ও কুফর বা আনুগত্য ও অবাধ্যতার প্রাচীন আড়াল করে আছে।

এরপর বলা হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। অর্থাৎ তাদের পার্থিব স্বার্থের জন্য নিজেদের পরিণাম তথা আখেরাতকে বরবাদ করো না। তোমাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসাকে এতটা প্রবল হতে দিও না যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে তোমাদের সম্পর্ক এবং ইসলামের প্রতি তোমাদের বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের প্রতি এতটা বিশ্বাস ও আস্থা রেখো না যাতে তোমাদের অসাবধানতার কারণে মুসলমানদের দলের গোপনীয় বিষয়সমূহ তারা অবগত হয়ে যেতে পারে এবং তা দুশমনদের হাতে পৌছে যায়। একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে এ বিষয়টি সম্পর্কেই সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে,

"কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। বলা হবে, তার সন্তান-সন্তুতিরা তার সব নেকী ধ্বংস করে ফেলেছে"।

সর্বশেষ বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতা দেখাও এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এর অর্থ হলো, তাদের শত্রুতা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে শুধু এই জন্য যে, তোমরা সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের আদর্শকে তাদের থেকে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনা করবে। এই সতর্কীকরণের অর্থ কখনো এ নয় যে, যা করতে বলা হলো তার চেয়ে আরো অগ্রসর হয়ে তোমারা স্ত্রী ও সন্তানদের মারতে শুরু করবে অথবা তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করবে অথবা সম্পর্ক এমন তিক্ত করে তুলবে যে, তোমাদের এবং তাদের পারিবারিক জীবন আযাবে পরিণত হবে। কারণ এরূপ করার দুটি স্পষ্ট ক্ষতি আছে। একটি হলো, এভাবে স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতির সংশোধনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। দ্বিতীয়টি হলো, এভাবে সমাজে ইসলামের বিরুদ্ধে উল্টা খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া এভাবে আশেপাশের লোকদের দৃষ্টিতে মুসলামানদের আখলাক ও চরিত্রের এমন একটি চিত্র ভেসে উঠে যাতে তারা মনে করতে শুরু করে যে, ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে সে নিজের ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য পর্যন্ত কঠোর ও বদমেজাজী হয়ে যায়।

এ প্রসংগে এ কথাটিও মনে রাখা উচিত যে, ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ যখন সবেমাত্র মুসলমান হতো এবং যদি তাদের পিতামাতা কাফেরই থেকে যেত তাহলে একটি সমস্যা দেখা দিত এই যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে নতুন দীন পরিত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করত। তাদের জন্য আরো একটি সমস্যা দেখা দিত তখন যখন তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা (কিংবা মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের স্বামী এবং সন্তানরা) কুফরকেই আঁকড়ে ধরে থাকত এবং সত্য দীনের পথ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করত। প্রথমোক্ত পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য সূরা আনকাবূতের (১৮ আয়াত) এবং সূরা লোকমান (১৪ ও ১৫ আয়াত) এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, দীনের ব্যাপারে কখনো পিতামাতার কথা অনুসরণ করবে না। তবে পার্থিব ব্যাপারে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। এখানে দ্বিতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নিজের দীনকে নিজের সন্তান-সন্তুতির হাত থেকে রক্ষা করার চিন্তা অবশ্যই করবে কিন্তু তাই বলে তাদের সাথে কঠোর আচরণ করবে না। বরং নমনীয় আচরণ করো এবং ক্ষমা ও উদারতা দেখাও। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহিমূল কুরআন, সূরা আত তাওবা, আয়াত, ২৩, ২৪; আল মুজাদালা, টীকা ৩৭; আল মুমতাহিনা, টীকা ১ থেকে ৩; আল মুনাফিকূন, টীকা ১৮)

অধ্যায়-২২: সূরা আত তাহরীম (৬৬) (নিষিদ্ধকরণ)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৬২

সূরা আত তাহরীম (৬৬) আয়াত ০৯

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর, তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, কতই না নিকৃষ্ট সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!

তাফসীর বলে

এ পর্যন্ত মুনাফিকদের কার্যকলাপের ব্যাপারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিল। এর দুটি কারণ ছিল। এক, তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের হাত এত বেশী শক্তিশালী হতে পারেনি, যে, বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে তারা ভেতরের শত্রুদের সাথেও লড়াই করতে পারতো। দুই, যারা সন্দেহ -সংশয়ে ডুবে ছিল ঈমান ও প্রত্যয় লাভ করার জন্য তাদেকে যথেষ্ট সুযোগ দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এ দুটি কারণ এখন আর বর্তমান ছিল না। মুসলিম শক্তি এখন সমগ্র আরব ভুখণ্ডকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছিল এবং আরবের বাইরের শক্তিগুলোর সাথে সংঘাতের সিলসিলা শুরু হতে যাচ্ছিল। এ কারণে ঘরের এ শত্রুদের মাথা গুড়ো করে দেয়া এখন সম্ভবও ছিল এবং অপরিহার্যও হয়ে পড়েছিল। তাহলে তারা আর বিদেশী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে দেশে আভ্যন্তরীণ বিপদ সৃষ্টি করতেপারতো না। তাছাড়া তাদেরকে ৯ বছর সময় দেয়া হয়েছিল চিন্তা-ভাবনা করার, বুঝার এবং আল্লাহরসত্য দীনকে যাচাই -পর্যালোচনা করার জন্য। তাদের মধ্যে যথার্থকল্যাণ লাভের কোন আকাংখা থাকলে তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারতো। এরপর তাদেরকে আরো বেশী সুযোগ সুবিধা দেয়ার মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও এবার জিহাদ শুরু করে দিতে হবেএবং এদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে উদার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে কঠোর নীতি অবলম্ব করতে হবে।

তাই বলে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও কঠোর নীতি অবলম্বন করার মানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয়। আসলে এর অর্থ হচ্ছে, তাদের মুনাফিকী মনোভাব ও কর্মনীতিকে এ পর্যন্ত যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং যে কারণে তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থেকেছে, সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের সমাজেরই একটি অংশ মেনে করেছে এবং তারা ইসলামী দল ও সংঘঠনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ও ইসলামী সমাজে মুনাফিকীর বিষ ছড়াবার যে সুযোগ পেয়েছে তা এখন ভবিষ্যতের

জন্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। এখন যে ব্যক্তিই মুসলমানদের অন্তরভুক্ত হয়ে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করবে এবং যার কার্যধারা থেকে একথাও প্রকাশ হবে, যে সে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুনিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়, সর্বসমক্ষে তার মুখোশ খুলে দিতে হবে। এবং নিন্দা করতে হবে। মুসলিম সমাজে তার মর্যাদা ও আস্থা লাভের সকল প্রকার সুযোগ খতম করে দিতে হবে।তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। দলীয় পরামর্শের ক্ষেত্রে থেকে তাকে দূরে রাখতে হবে। আদালতে তার সাক্ষ অনির্ভরযোগ্য গণ্য করতে হবে। বড় বড় পদ ও মর্যাদার দরজা তার জন্য বন্ধ করে দিতে হবে। সভা-সমিতিতে তাকে গুরুত্ব দেবে না। প্রত্যেক মুসলমান তার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সে নিজে অনুভব করতে পারে যে, সমগ্র মুসলিম সমাজে কোথাও তার কোন মর্যাদা ও গুরুত্ব নেই এবং কারো অন্তরে তার জন্য এতটুকু সম্ভ্রমবোধও নেই। তারপর তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি কোন সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তার অপরাধ লুকানো যাবে না এবং তাকে ক্ষমা করা ও যাবে না। বরং সর্বসমক্ষে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দামা চালাতে হবে এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এ পর্যায়ে মুসলমানদেরকে এ নির্দেশটি দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া ইসলামী সমাজকে অবনতি ও পতনের আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ থেকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না। যে জামায়াত ও সংগঠন তার নিজের মধ্যে মুনাফিক ও বিশ্বাসঘাতকদেরকে লালন করে এবং যেখানে দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা হয়, তার নৈতিক অধপতন এবং সবশেষে পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া গত্যন্তর নেই। মুনাফিকী প্লেগের মতো একটি মহামারী। আর মুনাফিক হচ্ছে এমন একটি ইদুর যে এ মহামারীর জীবাণু বহন করে বেড়ায়। তাকে জনবসতির মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেয়ার অর্থ গোটা জনবসতিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। মুসলমানদের সমাজে একজন মুনাফিকদের মর্যাদা ও সম্ভ্রম লাভ করার অর্থ হলো হাজার হাজার মানুষকে বিশ্বাসঘাতকতা ও মুনাফিকী করতে দুঃসাহস যোগানো। এতে সাধারণ্যে এ ধারণা বিস্তার লাভ করে যে, এ সমাজে মার্যাদা লাভ করার জন্য আন্তরিকতা, সদিচ্ছা, ও সাচ্চা ঈমানদারীর কোন প্রয়োজন নেই। বরং মিথ্যা ঈমানদের প্রদর্শনীয় সাথে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করেও এখানে মানুষ ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে উঠতে পারে। একথাটিই রসূলুল্লাহ (সা) তার একটি সংক্ষিপ্ত জ্ঞনগর্ভ বক্তব্যের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

"যে ব্যক্তি কোন বিদআতপন্থীকে সম্মান করলো সে আসলে ইসলামের ইমারত ভেংগে ফেলতে সাহায্য করলো"

অধ্যায়-২৩: সূরা আল মুযযাম্মিল (৭৩) (বস্ত্রাচ্ছাদনকারী)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৬৩

সূরা আল মুযযাম্মিল (৭৩) আয়াত ২০

তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি কখনও রাতের দু'তৃতীয়াংশ 'ইবাদাতের জন্য দাঁড়াও, কখনও অর্ধেক, কখনও রাতের এক তৃতীয়াংশ, তোমার সঙ্গী-সাথীদের একটি দলও (তাই করে)। আল্লাহ্ই রাত আর দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন, তোমরা তা যথাযথ হিসাব রেখে পালন করতে পারবে না। কাজেই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু পড়া তোমার জন্য সহজ হয়, তুমি ততটুকু পড়। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, আর কতক আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে যমীনে ভ্রমণ করবে, **আর কতক আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে।** কাজেই তোমাদের জন্য যতটুকু সহজসাধ্য হয় তাই তাথেকে পাঠ কর, আর নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও আর আল্লাহকে ঋণ দাও উত্তম ঋণ। তোমরা যা কিছু কল্যাণ নিজেদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট (সঞ্চিত) পাবে, তাই উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে খুব বড়। তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।

তাফসীর বলে

এখানে আল্লাহ তা"আলা হালাল রুজি উপার্জন এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উল্লেখ এক সাথে যেভাবে এবং অসুস্থতা জনিত অক্ষমতা ছাড়া এ দুটি কাজকেও তাহাজ্জুদ নামায এবং অব্যাহতি লাভের কিংবা তা কিছুটা লাঘব করার কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন তা থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম বৈধ পন্থায় রুজি উপার্জন করা কত বড় মর্যাদার কাজ। হযরত উমর (রা) বলেছেনঃ

আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া আর কোন অবস্থায় প্রাণ দেয়া আমার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় হয়ে থাকলে তা হলো এই যে, আমি আল্লাহর অনুগ্রহ বা মেহেরবানী অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কোন গিরিপথ অতিক্রম কালে সেখানে মৃত্যু এসে আমাকে আলিঙ্গল করছে। তার পর তিনি এ আয়াতটি পড়লেন। (বায়হাকী ফী শু"আবিল ঈমান)

অধ্যায়-২৪: সূরা আদ দাহর (৭৬) (মানুষ)

জিহাদ ও আক্রমণ: ১৬৪

সূরা আদ দাহর (৭৬) আয়াত ৮

তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও **বন্দীকে আহার্য দান করে।**

তাফসীর বলে

প্রাচীনকালে রীতি ছিল বন্দীদের হাতকড়া ও বেড়ী পরিয়ে প্রতিদিন বাইরে বের করে আনা হতো। তারপর তারা রাস্তায় রাস্তায় ও মহল্লায় মহল্লায় ভিক্ষা করে ক্ষুধা নিবারণ করতো। পরবর্তীকালে ইসলামী সরকার এ কুপ্রথাকে উচ্ছেদ করে। (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসূফ, পৃষ্ঠা ১৫০,মুদ্রণ ১৩৮২ হিঃ) এ আয়াতে বান্দী বলতে কাফের হোক বা মুসলমান, যুদ্ধবন্দী হোক বা অপরাধের কারণে বন্দী হোক সব রকম বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। বন্দী অবস্থায় তাদেরকে খাদ্য দেয়া হোক বা ভিক্ষা করানো হোক, সর্বাবস্তায় একজন অসহায় মানুষকে যে তার খাবার সংগ্রহের জন্য নিজে কোন চেষ্টা করতে পারে না- খাবার দেয়া অতি বড় নেকী ও সওয়াবের কাজ।

জিহাদ নিয়ে নবী মুহাম্মদের শেষ কথা!

সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) আয়াত ৫

তারপর (এই) নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে **মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে ঘেরাও কর, তাদের অপেক্ষায় প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওৎ পেতে বসে থাক।** কিন্তু তারা যদি তাওবাহ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।

মওদুদী যা বলেন না, ইবনে কাসীর তা বলেন!

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ **'আমি এই মর্মে আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকব যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়।'** (ফাতহুল বারী ১/৯৫, মুসলিম ১/৫৩)। যাহহাক ইবনে মুজাহিম (রহঃ) বলেন যে, **এটা হচ্ছে তরবারীর আয়াত যা মুশরিকদের সাথে কৃত সমস্ত সন্ধি-চুক্তিকে কর্তন করে দিয়েছে।** আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উক্তি রয়েছে যে, সূরা বারাআত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের সাথে আর কোন সন্ধি ও চুক্তি অবশিষ্ট থাকেনি। পূর্বশর্ত গুলি সমতার ভিত্তিতে ভেঙ্গে দেয়া হয়। সূরা বারাআত (তাওবাহ) নাযিল হওয়ার পর সমস্ত চুক্তি রাবিউল আখির মাসের দশ তারিখ শেষ হয়ে যায়। (তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে)

লেখকের শেষ বক্তব্য

নবী মুহাম্মদ ১০০ টির বেশি যুদ্ধ (জিহাদ) ও আক্রমণের শেষে, ইসলাম প্রচারের শেষ সময়ে, **অ-মুসলিম'দের বিরুদ্ধে না-শেষ-হওয়া এক যুদ্ধের ঘোষণা দেন;** এমন এক যুদ্ধের, **যা সমগ্র পৃথিবীতে একজন অমুসলিম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।** **সূরা তাওবাহ্ (০৯),** এই যুদ্ধ শুরুর ভূমিকা মাত্র; আর এখান থেকেই ইসলাম রূপান্তরিত হয়েছে (জিহাদ) যুদ্ধের ধর্মে, **আর কোরান রূপান্তরিত হয়েছে সবচেয়ে বড় জিহাদী নিষিদ্ধ বই-পত্রের মুখপত্র!**

ধন্যবাদ!

‘কোরানে জিহাদ ও আক্রমণের আহ্বান’

কোরানের আয়াতে যুদ্ধ এবং আক্রমণ সংক্রান্ত গবেষণা সংকলন।

কোরান কি জিহাদী বই-পত্রের মধ্যে গণ্য?

যদি তা না হয়, তবে তা কেন; আর যদি হয়, তাই বা কেন?

জিহাদ নিয়ে কী বলে কোরান? জিহাদ কি কেবলই মনের ময়লার বিরুদ্ধে, নাকি যুদ্ধ বলতে যা আমরা বুঝি, জিহাদ তাই?

এরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে এ ইবুকটিতে, চেষ্টা করা হয়েছে কোরানে প্রাপ্ত সকল যুদ্ধ (জিহাদ) ও আক্রমণ সংক্রান্ত আয়াত তুলে আনতে।

এই ইবুকটি পাঠ করার পর থেকে কোরানকে শান্তির বার্তা সংকলন ভাবতে অবশ্যই দ্বিধায় ভুগবেন আপনি!

একটি ধর্মকারী ইবুক

dhormockery@gmail.com
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net
www.kufrikitab.blogspot.com